শিক্ষা-সমস্যা।

যামিনীমোহন ঘোষ।

প্রকাশক :—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু,

এক্সচেঞ্জ পাব্লিসিং কোম্পানী,—

১৫ নং মাণিকতলা—মেন রোড্,

কলিকাতা।

সন ১৩২২ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,

মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌;
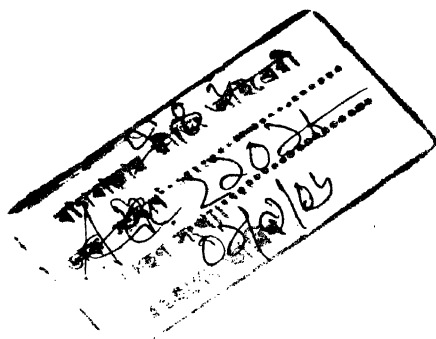
৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গ

যাহারা বর্ত্তমানে বর্ত্তমান, যাহারা ভবিষ্যতের একমাত্র আশা, তাহাদেরই করকমলে এই শিক্ষা-সমস্যা প্রদত্ত হইল।

যামিনী।

নিবেদন

আমি লেখক বলিয়া বাহাদুরী লইবার আশায় লেখনী ধারণ করিতেছি না, সে দুরাশা আমার নাই। সুতরাং প্রার্থনা করিতেছি, পাঠক-পাঠিকাগণ ভাষার ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া পড়িলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ।

———

বিজ্ঞাপন

পাঠকপাঠিকাগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে চৌদ্দ দিনের মধ্যে একযোগে তিন খানা পুস্তক প্রণয়ন এবং মুদ্রাঙ্কণ শেষ করায় ভাষার দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইল না এবং অনেক ভুলভ্রান্তিও রহিয়া গেল। সুতরাং প্রার্থনা, তাঁহারা ভাষার ত্রুটী এবং তৎসমুদয় মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

প্রকাশক।

যামিনী বাবুর

পুস্তকাবলীঃ—

সমাজ-সমস্যা	...	...	১৲
সংসার-সমস্যা	...	...	১৲
শিক্ষা-সমস্যা	...	...	১৲
পৃথিবী ভ্রমণ	...	...	৩৲

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

এক্স্‌চে'ঞ্জ পাব্‌লিসিং কোং

১৫ নং মাণিকতলা, মে'ন রোড,

কলিকাতা।

শিক্ষা-সমস্যা।
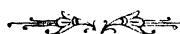
শিক্ষাই মানব-জীবনের সারবস্তু—প্রধান সম্বল। শিক্ষাকে সহচর করিয়াই জীবগণ সর্ব্বনিম্নস্তর হইতে ক্রমাগত চেষ্টায় সর্ব্বোচ্চস্তরে আরোহণ করে, শিক্ষাসাহায্যেই মানুষে অতি সামান্য অবস্থা হইতে জগতের সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে এবং শিক্ষা-সহযোগেই মানুষ মর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। শিক্ষা সামান্যকে অসামান্য, সাধারণকে অসাধারণ এবং অসম্মানিতকে অতিশয় সম্মানিত করিয়া দেয়। শিক্ষা অনুৎসাহিতকে উৎসাহিত, অক্ষমকে ক্ষমতাশালী এবং অনুন্নতকে উন্নত করে। শিক্ষা অমানুষকে মানুষ, অবোধকে বুদ্ধিমান্, এবং অসাধুকে সাধু করিয়া থাকে। শিক্ষা অপোগণ্ড—নরপশুকে মানুষ করিয়া দেয়; অপটু অপারগকে পটু এবং পারগে পরিণত করে, অযৌক্তিক অজ্ঞান, অধম বর্ব্বরকে জ্ঞানবান্

করিয়া তু'লে, অসাহসী নিস্তেজ দুর্ব্বলকে সবল ও সাহসী করিয়া মনুষ্যত্ব দান করে, শিক্ষা অনুন্নত অবনত অধম অধীন জাতিকে স্বাধীনতা দান করে। মানুষ শিক্ষা-সহযোগে দেবত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়। শিক্ষা পরশ পাথর,—যাহাতে স্পর্শ করাও সোনা ফলে। শিক্ষা মানুষের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য, অফুরন্ত সম্পদ্, এবং অমূল্য সম্বল।

অভিজ্ঞতা লাভই অভিনব মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। এই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মানুষ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ ও দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া মানুষের এতবার করিয়া জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণা স্বীকার এবং সহ্য করিবার আর কোনও কারণ নাই। মানুষ সাধ করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাজি হয় না। সেই দশমাস দশদিন গর্ভে বাস, ওঃ, কি ভয়ানক! একবারে ভাবনার বহির্ভূত। আর তার পর, আবার কত কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা কত সাধে গঠিত এই সুখের সোনার সংসার পরিত্যাগ! উঃ, কত কষ্ট! সমস্তটা একসঙ্গে ধারণা করাও কত ক্লেশকর—কত যন্ত্রণাদায়ক! কিন্তু মানুষ এই অভাবনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়া তবু আসিতেছে ও যাইতেছে! এই মানুষ পুনঃপুনঃ জন্মিতেছে, পুনঃপুনঃ এইরূপ কষ্ট করিয়া অতিযত্নে সোনার সংসার গঠন করিতেছে, এবং অবশেষে আবার সেই আজন্ম অর্জ্জিত, আশৈশব আকাঙ্ক্ষিত, এবং আজীবন অনুষ্ঠিত সুখের সাধের সংসার খানি ফেলিয়া রাখিয়া বিদায় হইতে বাধ্য হইতেছে! কি হৃদয়বিদারক! কি প্রাণস্পর্শী এবং কি মর্ম্মঘাতী

যন্ত্রণা! কিন্তু তথাপি মানুষ যায় ও আসে! কেন? কারণ —বাধ্য! কর্ম্মসূত্রের টানে মানুষ যাইতে বাধ্য, মরিতে বাধ্য — ত্যাগে বাধ্য! তাই যায়, মরে এবং তাই এই সাধের সংসার ত্যাগ করে। কেন করে? কেন মরে? কেন যায়? কারণ যাইতেই সে আসিয়াছে, থাকিতে নয়। যে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এখানে আসিয়াছিল, তাহা লাভ করিতে যতটুকু সময় দরকার হইয়াছে, এবং এই দেহ যত দিন টিকিতে পারে ততদিন হইয়া গিয়াছে, এ দেহ এখন অকর্ম্মণ্য, আর ইহারদ্বারা কাজ চলে না, এ জীর্ণ তরী আর বয় না, সুতরাং মানুষ, যতখানি অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা লইয়া তরী পরিবর্ত্তন করণার্থ পুরাতন দেহখানি পরিত্যাগ করত নূতন দেহ ধারণ করিয়া নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চলিল, মানুষ মরিল, এবং উদ্দেশ্যানুযায়ী অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিল। উদ্দেশ্য কি? অভিজ্ঞতা লাভ।

এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে লোকে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া থাকে। অভিজ্ঞতা লাভ করাই অভিনব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর সেই অভিজ্ঞতা লাভ করার উদ্দেশ্য ক্রমোন্নতি। অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া লোকে ক্রমে উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে। তাই মানুষ এত সহ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করিয়া থাকে; আর এই অভিজ্ঞতা লাভের প্রধান সোপান বা অবলম্বন শিক্ষা। অনন্ত জীবনে মানুষ অনন্ত রকম অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেই অনন্ত অসীম

ঈশ্বরের দিকে ছুটিতে থাকে এবং শিক্ষাই তাহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সহচর রূপে থাকিয়া তাহার সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বক্ষণ সহায়তা করে। শিক্ষা মানুষের একমাত্র বন্ধু, প্রধান সম্বল ও সংসার-ক্ষেত্রে একমাত্র সার পদার্থ। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, এবং ন্যায় অন্যায় এ সমুদয় বুঝাইয়া দেয়, শিক্ষা মানুষকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রে—এ জীবনসমরে শিক্ষাই মানুষের একমাত্র অবিচলিত অকৃত্রিম বন্ধু।

এই শিক্ষা অতি সামান্য অবস্থার সাধারণ কৃষক হইতে বিপুল বৈভবের অধিকারী বিরাট্ সাম্রাজ্য-শাসনকারী সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট দরকারী, সুতরাং সকলেরই আদরের সামগ্রী, যত্নের ধন। ইহা সকলেরই প্রয়োজনীয় বস্তু, সকলেরই ইহা চাই। এ সংসারে ইহা ছাড়া চলিবার যো নাই। কম আর বেশী, অল্প আর অধিক, যাহার যেমন যতটুকু দরকার, যাহার যে বিষয়ে যতটুকু খুসি, যাহার যে দিকে যতটুকু ইচ্ছা কিংবা অভিরুচী, সে ততটুকু গ্রহণ করে এবং তদনুরূপ ফলভোগ করে।

এই শিক্ষা লোকে জ্ঞানতঃ হো'ক, আর অজ্ঞানতঃ হো'ক, ইচ্ছায় হো'ক, আর অনিচ্ছায়ই হো'ক লাভ করিয়া থাকিত। ইহার গুরু প্রথমে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গ, তৎপরে প্রতিবেশী জনগণ, এবং তারপর পিতামাতা নিয়োজিত কোনও স্বতন্ত্র শিক্ষিত গুরু, আর তার এই ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্ব

প্রধান গুরু প্রকৃতি। শিষ্যগণ সর্ব্বদা গুরুগৃহে বাস করিত এবং গুরু মহাশয়ের নানারূপ পরিচর্য্যা করিত। গুরু দয়া করিয়া উপযুক্ত দিনে ও সময়ে নানাপ্রকার শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন ও নানারূপ আচার, নিয়ম, রীতিনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন এবং সময় বুঝিয়া শিষ্যবৃন্দকে প্রকৃতির প্রশস্তবক্ষে ইচ্ছামত বিচরণ করিবার সুবিধা দিতেন। শিষ্যগণও সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অবহেলা করিত না, প্রশস্তহৃদয়া প্রকৃতির নিকট প্রাণ খুলিয়া নানা প্রশ্নের অবতারণা করিত, প্রকৃতিও নানা রূপে সেই সমুদায়ের উত্তর প্রদান করিয়া পুত্রগণকে প্রফুল্লিত করিত। শিষ্যগণ উৎফুল্ল প্রাণে গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুরুর নিকট প্রকৃতিমীমাংসিত প্রশ্নসমূহের পুনরুত্থাপন করিয়া গুরুপ্রমুখাৎ তদুত্তর শ্রবণে নিঃসন্দেহ হইত এবং আপন মনে অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিত। এ সবই মুখে মুখে, কেবল স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া সম্পন্ন হইত। শাস্ত্রাদি সমুদয় পুরুষানুক্রমে এইরূপেই শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা লওয়া হইত। এ অবশ্য সেকালের কথা ও সেকালের শিক্ষা-পদ্ধতি।

কিন্তু যখন হইতে শব্দ লিখিবার জন্য সঙ্কেত বা অক্ষরের সৃষ্টি হইল, তখন হইতে পৃথিবীর শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। মানুষের জ্ঞান, গবেষণা, এবং অভিজ্ঞতা যাহার যাহা কিছু তাহা সব লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। শিক্ষা-জগতে নবযুগের আবির্ভাব হইল। মানুষ শিক্ষার অতিসামান্য মাত্র স্বাধীনতা পাইল। কিন্তু তথাপি প্রায় সম্পূর্ণ পরাধীন। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল

জগৎ অনেক পরিবর্ত্তনের পর ক্রমেই উন্নত হইতে লাগিল, মানুষের কল্পনাশক্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল ও বিকাশ পাইতে লাগিল এবং কালক্রমে শিক্ষার সুবিধার্থে মুদ্রাঙ্কনপ্রণালী আবিষ্কৃত হইল এবং তৎকালে যখন হইতে এই মুদ্রাঙ্কনপ্রণালী আবিষ্কৃত হইল তখন হইতে মানুষ শিক্ষার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইল। পৃথিবীতে শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। লোকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। লোকে অক্ষর চিনিয়া ইচ্ছামত বিষয়ের চর্চ্চা করিবার ও অভিরুচি অনুযায়ী বিষয় পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইল। পৃথিবী উন্নতিশিখরে আরোহণ করিবার সিঁড়ি পাইয়া প্রতিদিন উন্নতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময় যাহারা বুঝিল তাহারা সময় ও সুযোগ ছাড়িল না, সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম গতিতে দৌড়াইতে লাগিল এবং তৎফলে পুরস্কারস্বরূপ, আজ তাহারা স্বাধীন এবং প্রধান হইল; আর যাহারা সেই সময় সুযোগ অবহেলা করিয়া আলস্যের বশীভূত হইয়া ঘুমের ঘোরে কালকাটাইতে ভালবাসিল, তাহার ফলে আজ তাহারা পদানত, পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন হইল; তাহারা কালের আভাস মাত্র অনুভব করিয়া সুযোগের সন্ধান মাত্র পাইয়া তন্মুহূর্ত্ত হইতে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, অল্প সময়ের মধ্যে সকলে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া নিজের নিজের কাজগুলি সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গুছাইয়া লইতে লাগিল; আর আমরা সময়ের পরিবর্ত্তন বুঝিলাম না, সুযোগ ধরিতে প্রয়াশ পাইলাম না, নাকে সরিষার তৈল দিয়া আচ্ছা করিয়া ঘুমাইতে

লাগিলাম। আর তার পরিণাম? তাহাদের শতকরা ৯৫ জন শিক্ষিত, আর আমাদের শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত—নিরক্ষর। তাহারা প্রধান আর আমরা পদানত এবং তাহারা স্বাধীন আমরা পরাধীন! এমন কি, আজ—এই বর্ত্তমান সময়েও আমাদের এই অবস্থা! হায়রে শিক্ষা! শিক্ষা যে সার বস্তু—প্রধান সম্বল, এ কথা বুঝিতে এ ভারতে এখনও প্রায় সম্পূর্ণ শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। শিক্ষা যে অমূল্য নিধি ভারতবর্ষ এখনও এ কথা সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সেকালেও যেমন শত জনের কয়েক জন মাত্র আপনা হইতে উৎসুক হইয়া শিক্ষা লাভের জন্য গুরুগৃহে গমন করিত, আজ এ কালে এই বর্ত্তমান যুগে বর্ত্তমান সময়ে তেমনই কয়েক জন মাত্র আপনা হইতে শিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া আপনার অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এখনও সে স্রোত প্রবেশ করে নাই, সুতরাং তাহাদের প্রাণে এখনও শিক্ষা লাভের জন্য সে ঐকান্তিকী ইচ্ছার আজও উদ্রেক হয় নাই; তাহারা এখনও শিক্ষা যে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু এ কথা অনুভব করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা এখনও ইহার অভাবকে অভাব বলিয়াই ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহারা আবহমান কাল হইতে যেমন ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, আজও তেমনই ভাবে চলিয়া যাইতেছে; লিখিতে এবং পড়িতে শিখিলে তাহাদের কি সুবিধা, তদ্দ্বারা তাহারা কিরূপে উপকৃত হইতে পারে এবং তাহা হইতে কিরূপে তাহাদের সুখের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে,

এ কথা—এ চিন্তা কখনও বারেকের তরেও তাহাদের মনে উদিত হইতে পারে নাই। সুতরাং চিরদিন তাহারা এ সুবিধা, এ উপকার এবং এ সুখে বঞ্চিতই রহিয়াছে এবং এখনও রহিতেছে। তাহারা তখনও যেমন জ্ঞানের আলোক হইতে দূরে অবস্থান করিত, আজ একালে এখনও তেমনই দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেও সেই পূর্ব্বপুরুষানুক্রম শিক্ষিত নিজেদের অভিজ্ঞতা লইয়া আপন ব্যবসায়ের কার্য্য সম্পাদন করিত, আজ বর্ত্তমান সময়েও তাহারা তেমনই ভাবেই আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কোনও অসুবিধা কিংবা অভাব অনুভব করিতেছে না। তাহারা আপনার মনে যেমন চলিয়াছিল, তেমনই চলিতেছে, কোনও কথাটীও নাই। পৃথিবীর উন্নতিতে তাহাদের এমন কিছুই লাভ হয় নাই, শিক্ষা-জগতে নূতন যুগের আবির্ভাব হওয়াতে, নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন হওয়াতে তাহাদের কোনো উপকার হয় নাই। তাহারা যেমন ছিল, তেমনি আছে। শিক্ষায় কি সুবিধা, কি লাভ, কি উপকার, কিরূপে ইহারদ্বারা তাহাদের সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে পারে, এ কথা তাহারা এখনও ভাবিতে, বুঝিতে ও অনুভব করিতে অক্ষম। "যে তিমিরে তারা, সে তিমিরে।"

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই, যে এ যাবৎ এ কথা কেহ তাহাদিগকে বুঝাইতেও প্রয়াস পাইতেছে না। বরং কতিপয় স্বার্থপর নরাধমেরা আপনাদের সামান্য মাত্র স্বার্থ হানির আশঙ্কায় যদি বা কেহ শিক্ষার দিকে ধাবিত হইবার মনন করে, লেখাপড়া শিক্ষায় নানারূপ কুফল ফলিবার সম্ভাবনা দেখাইয়া

দিয়া তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে যত্নবান্ হয় এবং সাধারণতঃই তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হয়। এরূপ কার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছি এবং প্রতিবাদও করিয়াছি। কিন্তু এসব যেন মরুভূমে জলবিন্দু! যাই হউক, এই রূপই আজও ভারতবর্ষে শিক্ষার অবস্থা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলাম, তখন বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর সার এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার ভ্রমণ উপলক্ষে উক্ত মহাদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে নিউইয়র্ক সহরের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজ "আউট লুক"এ (Out Look) এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, "যেখানে শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব—শতকরা সর্ব্বত্র পাঁচ জনও নয়, এমন কি বাঙ্গালাদেশ, যাহা ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত প্রদেশ, সেখানেও শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২৫ পঁচিশ জনের বেশী নয়, সে দেশে স্বায়ত্তশাসন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিরূপে সে দেশের লোক স্বায়ত্তশাসন পাইতে আশা করিতে পারে?" তাঁহার এই উক্তির উত্তর আমি বারান্তরে ঐ পত্রিকায়ই লিখিয়াছিলাম এবং উহাও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহাই হউক, এখন প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষের এই অবস্থা কিরূপে বিদূরিত হইতে পারে? কিসে ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণে অন্ততঃ সামান্যরূপে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া আপনার হিসাব আপনি রাখিতে শিখিয়া সর্ব্ব সময়ে প্রবঞ্চকের হাতে প্রতারিত

না হয়; কিসে ইচ্ছা হইলে অভিরুচি-অনুযায়ী পুস্তকাদি পাঠ করিয়া পুলকিত হইতে পারে? কিরূপে, যখন হয়, বাসনা হইলে বাসনানুযায়ী বিষয় পাঠ করিয়া চর্চ্চা করত উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারে? কি উপায়ে ভারতের জনসাধারণ অন্ততঃ দৈনিক কাগজ [illegible] হইলে প্রতিদিন পৃথিবীর অবস্থা অবগত হইতে পারে? কিসে অন্যের অবস্থা দৃষ্টে নিজের অবস্থা কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারে? কিসে তাহাদের নিরক্ষরতা দূর হয়? কি উপায়ে, কি করিলে তাহারা আপনার হিসাব আপনি রাখিয়া আপন বুঝিয়া চলিতে পারে?

আমরা এযাবৎকাল আমাদের গভর্ণমেণ্টের আশ্বাস বাক্য শুনিয়া আসিয়াছি এবং এখনও শুনিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্তও, এ বিষয়ে, আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে দেখা গেল না। গভর্ণমেণ্ট কথানুযায়ী শিক্ষা সম্বন্ধে আজও এমন কিছুই করিতে পারেন নাই যাহা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করা যাইতে পারে। এমন কি শিক্ষা বিভাগে যতটুকু যাহা করিয়াছেন তাহা এবং তাহার ফল দৃষ্টে সুখী হওয়া ত দূরের কথা, প্রকৃতপক্ষে দুঃখিত হইতে হয়।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে শিক্ষার যেরূপ অবস্থা।

আমাদের গভর্ণমেণ্ট এদেশে কতকগুলি উচ্চ ইংরাজী স্কুল, কয়েকটী নিম্নশ্রেণীর কলেজ ও কয়েকটী ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা দশ বার বৎসর কাল এই সমুদয় স্কুল ও

কলেজে অধ্যয়ন করিয়া যাহা শিখিতে পারি তাহা শিখি এবং যে পরিমাণ সম্ভব জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাই সম্বল করিয়া কর্ম্ম-জগতে অবতীর্ণ হই। জীবন-সমরে ঘাতপ্রতিঘাতের জন্য ইহাই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। ইহাই মাত্র সম্বল লইয়া আমরা সংসার-সংগ্রামে প্রবেশ করিয়া থাকি। ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা, ইহা আমাদের সর্ব্বাবস্থায় রক্ষাকবচ।

কি শিক্ষা করি ?

কিন্তু দশ বার বৎসর কাল স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া আমরা কি শিক্ষা করি? তাহা কিরূপ? তদ্বারা আমরা কিরূপ ভাবে উপকৃত হইয়া থাকি তাহাই বর্ত্তমানে বিবেচ্য।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে প্রায় সব বিষয়ই শিখিবার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু সে সকল মুখে মুখে ও মনে মনে; কিন্তু হাতে কলমে শিখিবার সুবিধা নাই। যাহাই হউক, আমরা এই সমুদয় বিষয় শিখিতে আদিষ্ট হইয়া থাকি এবং অভিরুচি অনুযায়ী যাহার যাহা খুসি শিখিতে থাকি, কিন্তু যেহেতু বাস্তব জগতে বেড়াইবার মোটেই কোনও বন্দোবস্ত এ পর্য্যন্ত হয় নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমরা কেবল কল্পনা-জগতেই বিচরণ করিতে থাকি, এবং কাজে কাজেই আমরা যতটুকুও যাহা কিছু শিখি তাহা কল্পনায় পর্য্যবসিত; বাস্তব জগতে তাহার বসত মোটেই নাই; আমাদের শিক্ষা only theoretical and not at all practical. এই আমাদের শিক্ষা।

তারপর সার্টিফিকেট লইয়া হতানআরাসটি হইতে বাহির হইয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখন দেখিতে পাই যে আমরা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী যে যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদয় খাটাইবার ক্ষেত্র নাচ, আর আমাদেরও জ্ঞানের গভীরতা তত বেশী নয় যে আমরা নিজের একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া লই, আর তাহাতে যে অর্থ দরকার তাহাই বা পাই কোথায় ? আমাদের এই জ্ঞানগরিমা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কেই বা আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবে। তখন চারিদিক্ আঁধার দেখি ও "কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ়" হইয়া পড়ি। এবং কাজে কাজেই তখন বাধ্য হইয়া চাকরীর অন্বেষণ করিতে থাকি। নইলে উপায় ? ভাত না খাইলে তো চলিবে না ? পরিবার প্রতিপালন না করিলেও চলিবে না। অতএব তখন যত সব উচ্চ আশা অতলজলে ডুবাইয়া দিয়া কেবল 'হা অন্ন, হা চাকরী' করিয়া যথা তথা গমন করিতে থাকি। তখন আর কে কোন্ বিষয় শিক্ষা করিয়াছি তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। যে যাহাই পড়িয়া থাকি না কেন, তাহাতে আর কোনও দরকার নাই, দরকার কেবল কোথায় কি খালি আছে। কেউ বা তখন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটসিপের জন্য নমিনেশন্ খুঁজিতে লাগিল, কেউ বা ওভারসিয়ারের দিকে অগ্রসর হইল, কেহ বা চোর ঠেঙ্গাইতে পুলিশের সব্‌ইন্‌স্পেক্টরীর জন্য আর্জী করিল। আর যাহাদের বাপ, খুড়া, মামা কিংবা শ্বশুর আইন ব্যবসায়ী তাহারা আবার আস্তে আস্তে মন গুটাইয়া লইয়া তিন বৎসরের জন্য আইন

পড়িতে চলিল। এবং অবশিষ্ট গ্র্যাজুয়েটগণ যাহাদের পেছন ধরিবার বড় বেশী কেহ নাই, যাহাদের বাপ, খুড়া, জ্যেঠা, মামা, পিসা, কিংবা শ্বশুর কেহ বড়লোক কিংবা বড় চাকুরে নয়, তাহারা কেবল যথা তথা দরখাস্ত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবং কোন স্থলে একটা সামান্য কাজ খালি হইলে ভূরি ভূরি দরখাস্ত পড়িতে লাগিল। কি দুঃখেরই কথা বটে! যাই হ'ক, এই সমুদয় ইউনিভারসিটি এডুকেশন পাইয়া এই সমুদয় কলেজ ক্যারী করিয়া আমরা এইরূপ উপকৃত হই, এইরূপ শিক্ষা লাভে আমাদের এইরূপ সুবিধা। কেহবা কেমিষ্ট্রী পড়িয়া ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন, আর কেহ বা বটানী পড়িয়া শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া আইন অধ্যয়ন করিতে চলিলেন, আবার কেহ বা ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া শেষে গভর্ণমেণ্টের আপিসে পঞ্চাশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণী হইয়া অব্যাহতি পাইলেন। আবার আর কেহবা মেকেনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠাবসানে গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর আশায় হতাশ হইয়া অবশেষে ইলেকট্রিক্ ফিটার হইয়া কোনও প্রকারে জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে আমরা বিজ্ঞান-শিক্ষা, বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও তাহার সমাধি করিয়া থাকি এবং এইরূপে আমরা তদ্দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকি। এইরূপই আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চ্চা ও তৎফল গ্রহণ! এবং এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন যে এরূপ বিজ্ঞান শিক্ষা-দ্বারা আমাদের বিশেষ কোনই উপকার হয় না, ইহা হইতে আমরা এমন বিশেষ কোন ফল

লাভ করিতে সক্ষম হই না, যদ্বারা আমাদের নিজের কিংবা দেশের কোনও উপকার হইতে পারে। ইহা প্রায় বৃথা শিক্ষা।

স্কুল কলেজ, এবং ইউনিভারসিটি হইতে তাহা হইলে কি আমরা কোনও কিছুই শিখি না? কিংবা ইহা হইতে কোনও উপকারই পাই না?

স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটিতে অধ্যয়ন করিয়া আমরা কিছুই শিখি নাই, কি শিখি না, কিংবা কোনও রূপেই উপকৃত হই নাই, কি হই না, এ কথা আমি বলিতে পারি না ও চাই না; কেন না, এরূপ বলিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কিন্তু ভারতবাসী বিশেষ বঙ্গ-বাসীরা সেরূপ অকৃতজ্ঞ নয়। তবে কথা কি, যে, আমরা যে পরিমাণে উপকৃত হই, তাহা আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যয়ের তুলনায় অতি অল্প। শিক্ষার জন্য আমরা যে সময় দিয়া থাকি, সেই সময়ে অন্য দেশে অনেক অধিক পরিমাণে শিক্ষা পাইতে পারে। যে পরিমাণে শক্তি, সময় ও অধ্যবসায় ভারতীয় ছাত্র বৃন্দ ব্যয় করে, তত্তুলনায় যাহা তাহারা শিখিয়া থাকে তাহা অতিশয় কম।

শিখি কি ?

যাহা হউক, তবু আমরা এতদ্বারা কি শিক্ষা করিয়া থাকি এবং কি জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট ঋণী তাহাই বর্ত্তমানে আলোচনার বিষয়।

বার চৌদ্দ বৎসর স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভারসিটিতে উপস্থিত থাকিয়া আমরা আপ্রাণ চেষ্টায় ইংরেজী-ভাষা অধ্যয়ন করিয়া সেক্‌স্‌পীয়র, কার্‌লাইল, স্মাইল, মিল্‌টন্‌, দান্তে এবং বাইরন্‌ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তৎসমুদয় হইতে যে জ্ঞান লাভ করিতে পারি তাহাই করি এবং ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আর যতদূর যাহা হইতে পারে তাহাই হয়। মোটের উপর কথা এই যে, দশ বার বৎসর ধরিয়া আমরা ইংরেজীরই আরাধনা করি এবং তাহা হইতে আমাদের যতটুকু যাহা হইবার তাহা হয়। আসল কথা, এতদিন ধরিয়া আমরা কেবল ইংরেজীই শিখিয়া থাকি, কাজে কাজেই বলি যে, যে শক্তি, সময় ও অধ্যবসায়ের খরচ করিয়া যাহা আমরা শিক্ষা করি তাহা ব্যয়ের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। ব্যয়ের তুলনায় আয় বা লাভ অতি সামান্য। এবং ইহাকে অযথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ইহাতে বৃথা সময়ের অপব্যবহার বা অপব্যয় করা হয় এবং এই অপব্যয় বা অপ-ব্যবহারজনিত ক্ষতি সমস্ত জীবনেও পূরণ করিয়া উঠা যায় না। সময়ের অপব্যয় বা অপব্যবহার মহামূল্য জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি।

সময়ের অপর ব্যবহার বা অপব্যয় কিরূপে বলা যায়।

চীন, জাপান, তুরস্ক, পারস্য, মিশর, ইটালী, রুষ এবং জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশ হইতে আগত ছাত্রদিগকে দেখিয়াছি।

তাহারা যখন আমেরিকায় আগমন করিয়া কোন স্বতন্ত্র বিষয় শিক্ষা করার অভিলাষে আমেরিকান ইউনিভারসিটিতে প্রবেশ করিতে প্রয়াসী হয়, তখন, যদিও তাহারা নিজেদের দেশের ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটধারী গ্র্যাজুয়েট, তাহারা আমেরিকার ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অতএব ইংরেজী শিক্ষার্থে প্রথমে তাহারা কেবল ইংরেজীই পড়িতে থাকে এবং তিন মাস, ছয় মাস কিংবা একবৎসর কাল মধ্যে তাহারা ইংরেজী শিক্ষা করিয়া যখন ইংরেজী বক্তৃতা বুঝিতে সক্ষম হয়, তখন তাহারা, যে যে বিষয় শিখিতে আসিয়াছে সেই বিষয় পড়িতে আরম্ভ করে। আমেরিকান্ ইউনিভারসিটিতে বিদেশী ছাত্র-দিগকে এই সময় মধ্যে ইংরেজী শিখিতে দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয়, দশ বার বৎসর সময় এখানে ইংরেজী শিখিবার জন্য ব্যয় করা মহামূল্য সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই করা হয় না; ইহাকে সময়ের অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে 'এখানে আমরা এই দশ বার বৎসর কাল সময় কি কেবল এক ইংরেজী শিক্ষার জন্যই ব্যয় করিয়া থাকি? না, আরও কিছু শিখিয়া থাকি?' উত্তরে এই বলিতে পারি যে, আর যাহা শিখি, তাহা অতি সামান্য অকিঞ্চিৎকর। এবং যাহাও শিখিয়া থাকি, তাহার ব্যবহার এখানে তো একরূপ নাই-ই, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গেলেও তজ্জন্য Credit খুব কমই পাওয়া যায়। কেন না, দেখা গিয়াছে এতদ্দেশীয় ইউনিভারসিটির গ্রাজুয়েটগণ যাহারা

বাস্তবিকই পড়া-শুনা করিতে এবং প্রকৃত পক্ষেই পড়া-শুনা করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে বিদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়, তাহারা বিলাতী অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ এবং আমেরিকান্ হার্‌বার্ড ও ইয়েল্ শ্রেণীর ইউনিভার্‌সিটিতে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর উপরে আর যাইতে সক্ষম হয় না। আর যাহারা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেবল কাগজে কলমে ডিগ্রি চায়, তাহারা গ্র্যাজুয়েট কেন, এরূপ দেখা এবং শুনা গিয়াছে, গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেটের স্থলে এফ, এ, আই, এ, কিম্বা 'আই, এস্, সি'র সার্টিফিকেট দেখাইয়া পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়িবার অনুমতি লইয়াছে এবং এম, এ, ও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, সে সমুদয় ছাত্র কিংবা সেই প্রকার ইউনিভার্‌সিটির কথা বলা হইতেছে না; যাহারা বিজ্ঞান ভালবাসে, এবং যাহারা বৈজ্ঞানিক বিষয় বাস্তবিক পক্ষে জানিতে চায়, যাহারা প্রকৃত পক্ষেই জ্ঞান লাভে অভিলাষী এবং যে সমুদয় ইউনিভার্‌সিটি প্রকৃত পক্ষেই প্রশস্ত শিক্ষার স্থল, সেই সমুদয়ের কথা বলা হইতেছে। এবং সেই সমুদয় ইউনিভার্‌সিটির সহিত আমাদের দেশী ইউনিভার্‌সিটির তুলনা করিলে দেখা যায়, আমরা অমূল্য সময়ের অপব্যয় করিতেছি কি না; সামান্য লাভের জন্য বহুমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতেছি কি না? কি ব্যয়, আর কি লাভ।

কিন্তু কেন এ অপব্যয়? কেন এ অযথা সময় নষ্ট? কেন এতগুলি জীবনের এতটা সময়ের অপব্যবহার করা হয়?

এদেশী ইউনিভারসিটিগুলি কি আর অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ, হারবার্ড কিংবা ইয়েল শ্রেণীর ইউনিভারসিটিতে পরিণত হইতে পারে না? এদেশেবাসী কি শিক্ষার সুবিধার জন্য,—বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত? তবে হয় না কেন? এদেশী ইউনিভার্সিটি বিদেশী ইউনিভারসিটির ন্যায় উন্নত হইতে পারে না কেন? এদেশী ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েটদের বিদেশী ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েটদের ন্যায় আত্ম-বিশ্বাস হয় না কেন? ইহাদের সময় বৃথা ব্যয় হইবে কেন? ইহারা যথোচিত ব্যয় করিয়াও শেষে ব্যর্থমনস্কাম হইয়া 'ভ্যাগাবন্তের' মত ঘুরিয়া বেড়াইবে কেন? কি জন্য? কি পাপ? কেন এদেশীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রসমুদয় পাঠ পরিসমাপ্তে গভর্ণমেণ্টের চাকুরী না পাইলেই জীবনের উন্নতির আশায় হতাশ হইয়া পড়ে? কেন এদেশীয় ইউনিভারসিটির ছাত্রসমুদয় আত্ম-নির্ভরশীল হয় না? কেন যাহারা ইউনিভারসিটির শিক্ষায় শিক্ষিত তাহারা স্বাবলম্বী না হইয়া সতত পরমুখাপেক্ষী হয়? কেন তাহারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে যত্নবান্ না হইয়া সর্ব্বদা সতৃষ্ণ নয়নে পরের সাহায্য সাপেক্ষ হইয়া পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে? কেন, কি জন্য? কি অভাব? কি কারণ? শিক্ষার অপ্রতুলতা নয় কি? জ্ঞানের অগভীরতা নয় কি? বিজ্ঞানের বিপন্নাবস্থা নয় কি? প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবই কি প্রকৃত কারণ নয়? এদেশে যদি যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চর্চ্চা পূর্ব্বহইতে হইতে থাকিত, তবে কি আজ এদেশের এই

অবস্থা হইতে পারিত? বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবই কি এদেশের এ দুর্গতির কারণ নয়? কিন্তু এই বিজ্ঞান শিক্ষার সুবন্দোবস্ত এযাবৎ কাল কেন এদেশীয় ইউনিভার্সিটিতে হইতে পারে নাই? বিজ্ঞানশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভকরিতে হইলেই এদেশীয় ছাত্রদিগকে কেন বিদেশে যাইতে হইবে? কেন উপযুক্ত অধ্যাপক সকল আনয়ন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা হয় না? কেন বিজ্ঞান-শিক্ষাভিলাষী ছাত্রদিগকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া বিষয়ান্তর দেখিতে হয়? কি উত্তর?

এই হইল, শিক্ষার সুবিধা, আমাদের যেরূপ যাহা আছে তাহা, এবং তৎসমুদয় হইতে যেরূপে যে পরিমাণ যাহা শিখিতে পারি ও শিখিয়া থাকি এবং তদ্দারা ও তাহা হইতে যেরূপে যে যে রকমে আমরা উপকৃত হইয়া থাকি। এই আমাদের উচ্চ শিক্ষা, এই আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সোপান। এই পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষার কথা এবং এই পর্য্যন্তই এই শতাধিক বৎসরে হইতে পারিয়াছে। যাহাই হউক, এই গেল এই শিক্ষার কথা; এখন অন্য শিক্ষার কথা বলিব।

শিক্ষা-বিস্তার।

এ কথা সকলেই অবগত আছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা মোটের উপর এখনও শত করা পাঁচ জনের অধিক নয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, এখনও ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা এত কম কেন? আজও এখানে নিরক্ষরের নম্বর এত বেশী কেন? যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণ সুশিক্ষায় সুশোভিত, তখন সেই দিনে, এই ভারতবর্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা এত কম কেন? কেন নিরক্ষরের নম্বর আজও এ ভারতে এত বেশী? গত পঁয়তাল্লিশ বৎসর সময়ের মধ্যে জাপান তাহার সমস্ত লোক-সংখ্যার শতকরা পঁচানব্বই জন লোককে শিক্ষিত করিয়াছে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের নিগ্রো জনসাধারণের শত করা বায়ান্ন জনেরও উপর এবং ইহার আদিম নিবাসী "রেড্ ইণ্ডিয়ান"-দিগের শত করা তেত্রিশ জনের বেশী শিক্ষিত করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আজ একশত বৎরের অধিক সময়ের মধ্যে শতকরা এমন কি পঁচিশ জনও লিখিতে পড়িতে শিখিতে পারিল না। আজ এদিনেও ভারতে শতকরা পঁচিশ জন লোকেরও নিরক্ষরতা দূর হইতে পারিল না কেন, কারণ কি? ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয়? ইহা হইতে কি বুঝা উচিত? কি বুঝিব? কাজে কি কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয়? যে আশ্বাসবাণী শুনিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া এযাবৎকাল অপেক্ষা করিয়া আসিতেছি, আজ

পর্য্যন্ত কার্য্যাবলী দ্বারা তাহার বিশেষ কোনও স্বার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে কি ?

শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন ?

এই সমুদয় হইতে দেখা যায় যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে গভর্ণমেণ্ট এমন কিছুই করেন নাই যাহা অতীব প্রশংসনীয়। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি হাই স্কুল ও নিয়স্তরের কলেজের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দর্শনে দেশীয় রাজা ও জমিদারগণ আপন ব্যয়ে আর কতকগুলি স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া ঐ সংখ্যার সমষ্টি বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আছে, কতকগুলি সেকালের গুরুমহাশয়ের পাঠশালা। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্ট আজ কাল সেই সবগুলিকে সামান্য কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উন্নত করিতেছেন। এবং সুখের বিষয় এই যে কামার, কুমার, তাঁতি, এবং সাহা প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোকে হাতে পয়সা হওয়ায় তাহাদের ভদ্রলোক হইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে এবং তাহারা ইহাও বুঝিয়াছে যে ভদ্রলোক হইতে হইলে লেখা পড়া শিখা দরকার! এই জন্য আজ কা'ল তাহাদের মধ্যে শিক্ষার স্রোত কিয়ৎপরিমাণে প্রবাহিত হইয়াছে এবং তদ্দরুণ তাহারা উদ্যোগী হইয়া যায়গায় যায়গায় কতকগুলি মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টও সামান্য সামান্য সাহায্য করিয়া তাহাদের সেই সাধু চেষ্টায় সহায়তা করিতেছেন।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রের অবস্থা এইরূপ, এবং তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করণকল্পে গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থা এবং এই চেষ্টা দূর হইতে অবশ্য অতিশয় সুন্দর দেখাইবে; গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের হিসাব বহি দেখিলেই স্কুল কলেজের হিসাব খুব বড় বলিয়াই অনুমান হইবে, কিন্তু দেশের লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় তত্তুলনায় স্কুল কলেজের সংখ্যা অতি সামান্য। যতগুলি আছে, স্কুল কলেজের সংখ্যা তাহার কতগুণ বৃদ্ধি হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট হয়? আরও কত দরকার? আর ভারতগভর্ণমেণ্ট যেরূপ ভাবে এদিকে অগ্রসর হইতেছেন, এরূপভাবে চলিলে, সমস্ত ভারতে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে, যে হিসাবে চলিয়া আসিয়াছে, এই হিসাব অনুযায়ী কত সময়ের দরকার? যদি শতাধিক বৎসরে শতকরা কেবলমাত্র পাঁচজন করিয়া লোক শিক্ষিত করা সম্ভবপর হইয়া থাকে, তবে সমুদয় ভারতবাসীর নিরক্ষরতা দূর করিতে সেই অনুপাত অনুযায়ী কত বৎসর সময় দরকার হইবে? ভারতবাসী কতকাল আর এরূপ অবস্থায় কেবল মাত্র আশার ঘরে অপেক্ষা করিতে পারে? কত কাল আর এই ভাবে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিবে? এই আশাসূত্র যে বংশপরম্পরা ক্রমে টানা দরকার হইয়া পড়িল। আর কি কোনো উপায় নাই? ইহাপেক্ষা অল্প সময়ে শিক্ষাবিস্তার করিবার কি আর কোনও উপায় হইতে পারে না? ভারতবর্ষে কি ইহাপেক্ষা অল্প সময়ে

শিক্ষা বিস্তার হইতে পারে না? ভারত গভর্ণমেণ্ট কি ভারতের এই নিরক্ষরতা-দুঃখ মোচন করিতে অন্য কোনও সত্বর-উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না? অন্য কোনও রূপ শিক্ষারীতি কি এদেশে অবলম্বিত হইতে পারে না? বাধ্যতামূলক শিক্ষা-বিস্তার-প্রথার প্রবর্ত্তন কি এদেশে সম্ভবপর নয়? তবে কেন গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত আজও এদেশে এই রীতি অবলম্বন করিতেছেন না? ভারতবাসীরা কি শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুক? না, অসমর্থ? আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট নিগ্রোদের শতকরা ৫২ বায়ান্ন জন এবং রেড্ ইণ্ডিয়ানদের শত করা তেত্রিশ জন শিক্ষিত করিতে পারিল, আর জাপান শতকরা ৯৫ পঁচানব্বই জন শিক্ষিত করিতে পারিল, আর ভারতগবর্ণমেণ্ট শতাধিক বৎসরে শতকরা পঁচিশ জনও শিক্ষিত করিতে পারিলেন না! এ কি বড় প্রশংসা, না গৌরবের কথা? ভারতবাসীরা কি জাপানবাসী অপেক্ষাও অধম? 'রেড্ ইণ্ডিয়ান' হইতে অকর্ম্মণ্য? নিগ্রো হইতেও নিকৃষ্ট? না, কি? কি কারণ? একি ভারত-বাসীদের অক্ষমতা—অকর্ম্মণ্যতা বা শিক্ষায় অমনোযোগিতার দোষ? না কি গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিস্তারে শিথিলতার দোষ? কাহার দোষ? কিসের দোষ? কে দোষী? আজও ভারতে শিক্ষাবিস্তার না হওয়ার জন্য কে দোষী? কে দায়ী? আজও ভারতবর্ষের নিরক্ষরতার জন্য কে দায়ী?

অনারেবল স্বর্গীয় মিঃ গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লের দূরদৃষ্টি ।

অনারেবল স্বর্গীয় মিঃ গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে তাঁহার প্রখর চিন্তাশক্তির সাহায্যে ভবিষ্যৎ ভারত কিরূপে বাস্তবিক পক্ষে মঙ্গলময় হইবে, কিসে ভবিষ্যৎ ভারত সুখের হইতে পারিবে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন ; কিসে, কি করিলে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে একদিন উন্নতশিরে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে। ভারতবর্ষকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইলে এইদণ্ডে কি করা কর্ত্তব্য, ভারতবর্ষ যদি ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা করে, তবে বর্ত্তমানে তাহার কি করা উচিত, ভারতবাসী যদি ভবিষ্যতে মঙ্গল কামনা করে, যদি তাহারা কোনও দিন জগতের মাননীয় ও পূজনীয় জাতি সকলের সমকক্ষ হইতে আশা করে, যদি কোনও দিন নিজের পায়ের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে চায়, তবে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে কি করা উচিত এবং ভারতবাসীর কি চাওয়া উচিত। ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে বাস্তবিক পক্ষে কি অভাব, ভারতবাসী বর্ত্তমানে কি চায়, কি চাওয়া উচিত মিঃ গোখ্‌লে তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাই ভারতে শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় বারংবার বাধ্যতামূলক শিক্ষারীতি অবলম্বন করিতে প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলেন।

যদিও, বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতগভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইতে পারে নাই এবং মিঃ গোখ্‌লেও তাঁহার অভিলষিত সংকর্ম্মের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের যে সুখচিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, অকালে কালের কবলে নিপতিত হওয়ায় বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনি তাহার বাহ্যিক বিকাশের অঙ্কুর মাত্রও অবলোকন করিয়া যাইতে পারিলেন না।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মাননীয় গোখ্‌লের প্রস্তাব কি কোনও প্রকারে অন্যায় কিংবা অসঙ্গত ছিল? যাহা বহুদিন পূর্ব্বে অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং যাহা বহুপূর্ব্বে এখানেও প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার কারণ কি? যাহা প্রবর্ত্তনে অতি অল্প দিন মধ্যেই ভারতাকাশ নব আভায় উদ্ভাসিত হইবে, যাহার প্রবর্ত্তনে ভারতবর্ষ নূতন আলোকে আলোকিত হইবে, যাহা হইলে ভারতবাসী পরম পুলকিত হইবে, যাহা হইলে ভারতের জনসাধারণের চক্ষুদান করা হইবে, যাহা একমাত্র ভারতবাসীর আজকাল চাইবার জিনিষ, যাহা বর্ত্তমান ভারতের প্রধান অভাব, এবং যে প্রস্তাব সমর্থিত, অনুমোদিত, এবং গৃহীত হইলে ভবিষ্যৎ ভারত আকাশ একবারে পরিষ্কার হইয়া যাইত, সে প্রস্তাব কেন পরিগৃহীত হইল না? কি দোষ—কি ক্ষতির সম্ভাবনা? আছে কি কিছু? কি উত্তর? কি অভাব? কেন হইল না? ভারত গভর্ণমেণ্ট কেন এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন না? বিশেষ কোনও আপ-

ত্তির কারণ আছে কি? থাকিতে পারে কি? যদি থাকে, তবে কি তাহা? অর্থের অনাটন? ভারত গভর্ণমেণ্টের তহবিলে টাকা নাই কি? বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তন করিতে যে পরিমাণ টাকা দরকার তদনুরূপ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্টের তহবিলে নাই নাকি? যদি তাহাই হয়, ভারত গভর্ণমেণ্ট তবে তৎপ্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে কি অক্ষম? ভারত গভর্ণমেণ্ট কি তাহার প্রতীকার করিতে পারেন না? ইচ্ছা করিলে কি ভারত গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত অর্থের সংগ্রহ করিতে পারেন না? যাহার ইঙ্গিতমাত্র কোটী কোটী টাকা অতি অল্প সময় মধ্যে আদায় হইতে পারে, তাঁহার আবার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য টাকার ভাবনা কি? অথবা যাঁহার ইচ্ছায় এমন কি ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণের নিকট হইতে অবাধে এই টাকা আদায় হইতে পারে, তাঁহার আবার অর্থের অভাব কেমন? প্রজারা কি এই টাকা দিতে অস্বীকৃত হইবে? যাহারা মরিতে মরিতেও এত প্রকারে এত বিষয়ের জন্য এত ভাবে এত এত টাকা অতর্কিত ভাবে দিয়া আসিতেছে, তাহারা কি যাহাতে তাহাদেরই মঙ্গল হইবে, যদ্দ্বারা তাহাদেরই চক্ষুদান করা হইবে, এবং কেবলমাত্র যাহার উপর তাহাদের ভাবী মঙ্গলের আশা ভরসা সর্ব্বপ্রকারে নির্ভর করিতেছে, তাহার জন্য তাহারা যথাসাধ্য দিতে অস্বীকার করিবে? যাহারা এতপ্রকারের ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে, যাহারা দেশবিদেশে নানাবিষয়ের জন্য কোটী কোটী টাকা নানাপ্রকারের চাঁদা দিয়া আসিতেছে, তাহারা অতিপ্রিয় শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য

করিতে কুণ্ঠিত হইবে? আচ্ছা, আজ যদি গভর্ণমেণ্ট আর কোনও বিষয়ের জন্ম তাহাদের উপর নূতন রকমের এক কর বসাইতে বাধ্য হ'ন, ভারতবাসী কি সেই করপ্রদানে অসম্মত হইতে পারিবে? সম্ভবতঃ কিছুতেই নয়, আর গভর্ণমেণ্ট যদি কেবলমাত্র ইচ্ছা করিয়া এই কর বসাইতে চাহেন, তবে কি ইহাই আদায় হইবে না? তবে কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি যে ভারত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়, কাজে কাজেই স্বর্গীয় মাননীয় মিঃ গোখ্লের প্রস্তাব বর্ত্তমানে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ইহা স্বীকার করা যায় না, সুতরাং স্বীকার করিতে পারি না। যে গভর্ণমেণ্টের সমগ্র দেশের উপর এমন একটা আধিপত্য বর্ত্তমান, যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে এই ভারতে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ে লয় প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে ভারতবর্ষে বিশেষ ভারতবাসীরই মঙ্গলের জন্ম, বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইতে পারিতেছে না, এবং তাহাও টাকার জন্ম! ভারতগভর্ণমেণ্ট অর্থাভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না, আর ভারতবাসী আপনার চক্ষুদানের জন্ম অর্থদানে কুণ্ঠিত! সম্ভবপর কি? যদি না হয়, তবে কি বুঝিব? মাননীয় মিঃ গোখ্লের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত না হইবার কারণ আর কি বুঝিব? আর কি বুঝা উচিত?

কথা এবং কাজ।

যাহাই হউক, এই হইল গভর্ণমেণ্টের কথা এবং কাজ। সেই আশ্বাসবাণী, আর এই আশা পূরাণ। সেই Proclamation আর এই প্রজার বাসনা পূর্ণ করন! সেই কথা, আর এই কাজ! প্রশংসনীয় কি? এই এত বৎসর সময়ের ভিতর যে কাজ হইয়াছে, অন্য বিভাগের কথা বলিতেছি না, সে ত অনেক দূরের কথা, এবং অনেক বেশী কথা, এই শিক্ষা বিভাগের কথা বলিতেছি, এই বিভাগে যতদিনে যেরূপ ভাবে যতটা কাজ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা কি সন্তোষজনক? শতাধিক বৎসর একটা দেশ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জাতীর অধীনে অবস্থান করার পর যদি তাহার শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা পাঁচজনেরও কম হয়, তবে তাহা কি বড় প্রশংসনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে? বাহিরের চকচকে দৃশ্যের পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিলে, যাহা দেখা যায়, তাহা দেখিয়া প্রাণ পরিতুষ্ট হয় কি? বাহিরের লোকে বাহ্যিক দৃশ্য দেখিয়া বিমোহিত হইতে পারে, কিংবা অন্তর্দৃষ্টি হারাইতে পারে, কিন্তু যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, যাহারা বাহিরের চকচকে দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া আপনার দৃষ্টিশক্তি না হারায়, তাহারা দেখিবে, বুঝিবে এবং বলিবে যত দিনে যে কাজ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা সন্তোষজনক কিংবা সুখের নয়।

কিন্তু যাহাই হউক, অবশ্য যাহা সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে, তাহা হইয়াছে। এবং গভর্ণমেণ্টের যেরূপ ইচ্ছা ও তদনুযায়ী যেরূপ লিপি অবলম্বন করা উচিত, তাহা অবশ্যই করিবেন ও

করিতেছেন; সেখানে আমাদের কথা কতদূর খাটিবে, কতদূর টিকিবে তাহা ভগবানই জানেন। তবে কথা এই, সব আমাদের অভাব, আমাদের অসুবিধা, এবং আমাদেরই কষ্ট ভোগ করিতে হয়, আমরাই অসুবিধা অনুভব করি, আমাদেরই প্রাণে লাগে, তাই দুঃখে দুইটা প্রাণের কথা মুখে আসা অসম্ভব নয়, তাই বলিতে হয় ও বলি।

যে সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থে গভর্ণমেণ্ট এদেশে যতগুলি স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটির সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদয়ে যেরূপ যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, ও হইতে পারিয়াছে, এযাবৎ দেশের তৎসমুদয়ে পাঠ করিয়া লোক যে পরিমাণে যতদূর শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা দেশী লোক দেশের উন্নতি কল্পে যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে, দেশী লোকের দেশের কাজে লাগিবার ক্ষমতা সেই শিক্ষা হইতে যে পরিমাণে বাড়িতে কিংবা পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছে, সেই শিক্ষা হইতে দেশের লোকের উপযুক্ততা, যতখানি বৃদ্ধি হইতে পারিয়াছে কিংবা হইয়াছে, দেশ যতটা উন্নত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছে। তৎপর শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে যতদূর যাহা হইতে পারিয়াছে তাহা হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট সেদিকে এযাবৎ যেরূপে যাহা করিতে পারিয়াছেন, বা যেরূপে যাহা করিতে পারিবেন কিংবা করিবেন, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, এবং সমগ্র ভারতে শিক্ষা বিস্তার করিতে এই অনুপাতে কত কাল লাগিবে, তাহা স্পষ্ট-চক্ষে সকলেই দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন। বর্ত্তমানে

আমাদের যাহা অভাব, ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতির জন্য আমাদের যাহা একান্ত দরকার, যাহা হইলে বর্ত্তমানে আমাদের চক্ষুদান করা হয়, যাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি মেঘবিমুক্ত হয়, তজ্জন্য আমাদের মাথার মণি, আমাদের শিরোভূষণ, ভারতের সুসন্তান, ভারত-প্রাণ, ভারত গভর্ণমেণ্টেরই অনুগত বন্ধু অনারেবল স্বর্গীয় মিঃ গোখ্‌লে বারংবার প্রস্তাব করিয়াও বিফল-মনোরথ হইলেন, শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যাহা হইবার, তাহা অন্ততঃ সম্প্রতিকের জন্য এইরূপে পরিসমাপ্ত হইল, আমাদের ঐ আশার একরূপ অবসান হইল।

কর্ত্তব্য কি।

যা'ক এখন ও কথা, উহাতে আর প্রয়োজন নাই। গভর্ণমেণ্টের যেরূপ ইচ্ছা করিবেন, যে ভাবে সুবিধা মনে করিবেন, সে ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং যে পলিসি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বোধ করিবেন, তাহা অবশ্য করিবেন। এবং এখন হইতে স্পষ্টরূপে দেখা এবং বুঝা গেল যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কথাবার্ত্তা, আপত্তি অনুযোগ, অথবা অনুরোধ উপরোধ কিছুই বড় বেশী খাটিবে না। সাক্ষী-গোপাল-সদৃশ ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া থাকিব এবং সভায় যাহা যাহা বলা হয়, বিবেক বিবেচনা বিরহিতের ন্যায় তাহাতেই 'হুঁ" দিব এই আমাদের কর্ম্ম। আমরা ইচ্ছা হইলে যাহা বুঝি,

বলিতে পারিব, কিন্তু তাহাতে বেশী কিছু আসে যায় না, যাহা হইবার, তাহা পূর্ব্বেই হইয়া আছে। মোট কথা, আমাদের কথাবার্ত্তা, আপত্তি অনুযোগ কিংবা অনুরোধ উপরোধে বিশেষ কিছুই আসে যায় না, গভর্ণমেণ্ট যেবিষয়ে যেরূপ ভাবে যেরূপে যাহা করা সমীচীন ও সুবিধা বোধ করেন, তাহা অবশ্য করিতেছেন ও করিবেন। সুতরাং সেখানে আমাদের অধিক মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন। অতএব বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই "এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি করিতে পারি? আমাদের কি করা উচিত? আমাদের কি করিতে পারা উচিত? বর্ত্তমানে আমাদের যাহা প্রধান অভাব, তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছি, এবং সেই অভাব বিদুরিত করণার্থে গভর্ণমেণ্টকে যথোপযুক্ত প্রকারে অনুরোধ করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি; কিন্তু এখন কি কর্ত্তব্য? অবশ্য দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের শিক্ষা সংরক্ষণ ও শাসনের জন্য দেশের গভর্ণমেণ্টই সর্ব্বতোভাবে দায়ী; সর্ব্বত্রই গভর্ণমেণ্টই শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন; এখানেও শুনিতে পাই স্বীকার করেন। কিন্তু কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে তাহা যেরূপ ভাবে কার্য্যে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের ধৈর্য্যের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায়, সুতরাং স্বীকার-উক্তি তেমন সুখের নয়। অতএব জিজ্ঞাস্য, ইহাই যদি প্রকৃত অবস্থা, তবে বর্ত্তমানে ভারতবাসীর এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি?

যদি গভর্ণমেণ্ট যে ভাবে দায়িত্ব স্বীকার করেন ও যে ভাবে অগ্রসর হইতেছেন তাহা সন্তুষ্টজনক না হয়, তবে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব কাহাকে দিবে ? কে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ? কে এই দায়িত্ব ঘাড় পাতিয়া লইবে ? এ দেশবাসীর শিক্ষা অশিক্ষার জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে দায়ী কে ? কাহার দরকার ? কে নিরক্ষর ? কে শিক্ষা চায় ? কাহার শিক্ষা নাই ? কাহার অভাব ? কে দায়ী ?

জগতে কে দায়ী হইয়া থাকে ? যাহার ঠেকা, যাহার দরকার, যাহার অভাব, ও যে চায়। আর চায় কে ? যাহার দরকার, যাহার অভাব এবং যাহার নাই। লিখিতে পড়িতে আমরা জানি না, শিক্ষা আমাদের নাই, এবং নিরক্ষর আমরা ; শিক্ষার অভাব আমাদের, আমরা শিক্ষা চাই। লেখা পড়া শিখিলে আমাদের চক্ষুদান হয়, না জানায় আমরা দেখিতে পাই না, আমাদের অসুবিধা, সুতরাং ঠেকা আমাদের, অভাব আমাদের, দরকার আমাদের, শিক্ষা চাই আমরা। অতএব দায়ী আমরা, আমাদের অভাব মোচন করিতে আমরা দায়ী। আমাদের যাহা দরকার তাহা সংগ্রহ করিতে, আমরা দায়ী। আমাদের যাহা নাই, তাহা পাইতে আমরা দায়ী। যাহা না হইলে অসুবিধা ভোগ আমরা করি, তাহা হওয়া বা করার জন্য আমরা দায়ী। আমাদের অশিক্ষা বা নিরক্ষরতার জন্য অসুবিধা ভোগ আমরা করি, শিক্ষার অভাবে যে শাস্তি ভোগ করিতে হয় তাহা আমরা করি, এবং এই অশিক্ষা বা নিরক্ষরতা

দূর হইলে, চক্ষুদান আমাদের, অভাব মোচন আমাদের, অসুবিধার অন্ত আমাদের এবং ভাবী সুখের অধিকারী আমরা হইব। এক কথায়, অভাবে দুঃখভোগ আমাদের এবং অভাবান্তে সুখের অধিকারীও আমরা, সবই আমাদের ও আমরা। যদি তাহাই হইল, যদি সুখ দুঃখ সকলই আমাদের, তবে দায়ী হইবে কি ভিন্ন দেশের লোক? মাছ আমাদের, মুড়াও 'তদৈবচ', কাঁটাগুলি কেবল অন্যের? দুধ খাব আমি, গাভী পালন করার জন্য দায়ী অন্য লোক! সুখভোগ আমার, কিন্তু সুখের জন্য যে আয়াস দরকার তজ্জন্য দায়ী অন্য লোক? শিক্ষা দরকার আমাদের, শিক্ষিত হইলে সুখ ও সুবিধা আমাদের, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী হইবে ভিন্ন দেশের লোক? কেমন নয়? পরের উপর ঝোল ভাত খাইতে বড়ই সুবিধা, এঁ্যা? পরের টাকায় বড়মানুষ হইতে পারিলে বড় সুখ? পরের পয়সায় 'পজিসন' খরিদ করিতে পারিলে একবারে "পোয়া বার তের"? আর পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিতে পারিলে, আঁটা লাগিবার ভয় একদম থাকে না? এবং পরের পরিশ্রমে কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিলে তার তুল্য সুখ নাই? পরের দায়িত্বে প্রতিজন পালন করা অতীব আনন্দজনক, কেমন তাই না? অভাব আমাদের, আর তাহা মোচন করিয়া দিবে অন্যে, আমাদের জন্য দায়ী অন্যে, কেমন নয়? ইহার চেয়ে সুখের আর কি হইতে পারে, কেমন? পরের উপরে হইতে পারিলে, তা'র চেয়ে আর সুখের কি? আমাদের জন্য দায়ী অন্যে? কেমন?

কিন্তু এরূপ কি কখনও হয়? আমার সুখ দুঃখের জন্য কি অন্যে দায়ী হইতে পারে? কবি তাহার কবিতায় অবশ্য লিখিয়াছেন এবং অতি মিষ্টস্বরে গাহিয়াছেন, "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" এবং কথাটায় যে সত্যতার অভাব, তাহা নহে, ইহা ঠিক, "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন সকলেই পর; এ পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করিবার সময় কেহই সঙ্গে যাইবে না। পুত্র পরিবার প্রভৃতি আপন জনগণ পরের ন্যায় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কেহই আপন হইয়া সঙ্গে যাইবে না। কাহাকেও আপন করিয়া সাথে সাথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইব না। সকলেই তখন পর হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে ও আপনি পর হইয়া পরের ন্যায় আপন পথে চলিয়া যাইব; সুতরাং এ জগতে, এই মরজগতে যাহা কিছু করা হইয়াছে, তাহা তখন দেখা যায় পরের জন্যই করা হইয়াছে; যাহা কিছু সবই পরের জন্যই পরিয়া রহিল, পরেই ভোগ করিবে; আমি দুনিয়ার সম্পর্ক ছাড়িয়া চলিলাম, সকলের নিকট পর হইলাম, সকলকে পর করিলাম, দুনিয়া হইতে পর হইয়া চলিলাম; জীবন ভরিয়া যাহা কিছু করিলাম, তাহা সকলই পরের তরেই পড়িয়া রহিল। যে কিছু সব করিলাম, সকলই পরের জন্যই করা হইল। কবির "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইল।

কিন্তু "সকলেই আমরা আপন তরে" একথাও কবিবরের গীতগাথা, "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" কথার ন্যায় একইরূপ

ঠিক। এবাক্যেও ঠিক সেইরূপ সত্যতা সঞ্জীবিত রহিয়াছে। ইহাতেও সেইরূপ সত্য সংগুপ্ত রহিয়াছে। সেখানে যেমন স্পষ্ট দেখিতে পাই, বাস্তবিকই "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে", এখানেও তেমনই দেখিতে পাইব যে "সকলেই আমরা আপন তরে।" কে কাহার জন্য কি করে? যে যাহা করে, নিজের জন্য করে। কে কাহার? যে যাহার আপন আপন নিজের। কে কাহার জন্য দায়ী? যে যাহার নিজের জন্য দায়ী। কে তোমার জন্য দায়ী? তুমি নিজে মাত্র, তোমার জন্য দায়ী। তুমি কর্ম্ম করিবে, তুমিই সে কর্ম্মফল ভোগ করিবে। তোমার কর্ম্ম, তোমার ধর্ম্ম! তুমি তোমার মহাস্বার্থ বা পরমার্থের প্রয়াসে পরহিতার্থে আত্মদান করিতেছ, যাহা কিছু পরের জন্য প্রস্তুত করিতেছ। তুমি তোমারই অন্তর্নিহিত গুপ্ত সুপ্ত শক্তির পরীক্ষার জন্য যাহা কিছু মানবিক জ্ঞানানুযায়ী যাহা কিছু হয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া শেষে তাহাই সম্পাদন করিয়া থাক। তোমারই আত্মবিকাশের জন্য, তোমারই আত্মশক্তির অভিব্যক্তির নিমিত্ত যাহা কিছু করিয়া থাক, এবং তাহাতেই, সেই শক্তি প্রয়োগ হইতে, যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে; উৎপন্ন বস্তু এখানে উদ্দেশ্য নয়, আত্মোন্নতি—আত্মার ক্রমবিকাশই একমাত্র উদ্দেশ্য এবং উৎপন্ন যাহা, তাহা উপভোগ্য মাত্র। রাজ্য করিবার উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজের চেষ্টায় আত্মশক্তির প্রকাশে ও প্রভাবে কালে আমি যথার্থই রাজ্য লাভ করিলাম। উৎপন্ন বা অর্জ্জিত রাজ্য তখন আমার উপভোগ্য,

এবং শেষে ইহা পরের তরে পরিত্যাজ্য হইবে। আর যে শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমি রাজ্যলাভ করিতে সক্ষম হইলাম, যে শক্তি পূর্ব্বে আমার মধ্যে গুপ্ত বা সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করিতেছিল, তাহার বিকাশ, প্রকাশ, প্রয়োগ ও পরীক্ষাই আমার আত্মোন্নতি। এই আত্মোন্নতিই আমার স্বার্থ, মহাস্বার্থ বা পরমার্থ! এই রাজ-শক্তি বিকাশরূপ লাভের জন্য, এই মহাস্বার্থ বা পরমার্থের নিমিত্ত আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি, এবং এই কর্ম্মের ফলে যাহা উৎপন্ন, তাহা ভোগ্য এবং আপনার ভোগান্তে "পরের তরে পরিত্যাজ্য"! এবং এই যে আত্মবিকাশরূপ লাভ ইহা আমার আপনার তরে। ইহা পরের তরে নয়, ইহা পরিত্যাজ্য নয়, ইহা রাখিয়া যাইতে হইবে না; ইহা সঙ্গে যাইবে, ইহা সম্বল। ইহা পথের সম্বল, পরিত্যাজ্য নয়। ইহা আমার সাথের সাথী,—জীবনসঙ্গী। ইহারই জন্যই কর্ম্মব্রত গ্রহণ, ইহাই অভিনব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আমাদের নিজের জন্য; আর ইহার নিমিত্ত যে কর্ম্মাবলম্বন, তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন বা অর্জ্জন করা হয়, তাহা পরের তরে!

অতএব দেখা যায়, যেমনই "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে," তেমনই "সকলেই আমরা নিজের তরে।" যা'র যা'র জন্য সেই সেই দায়ী। সকলেই নিজের নিজের জন্য দায়ী। কেহই অন্য কাহারও জন্য দায়ী হয় না; সকলেই দায়ী আপন তরে। আমা-দের জন্য দায়ী আমরা, আর কেহই নয়, আমাদের শিক্ষা অশিক্ষার জন্য আমরা দায়ী। দায়ী আমরা, অন্যে নয়। অতএব বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য অবধারণ করাও আমাদের কাজ। ভারতের সর্ব্বপ্রকার

মঙ্গলামঙ্গল, শিক্ষা অশিক্ষা, উন্নতি অবনতি, এবং অধঃপতনের জন্য ভারতবাসীরাই দায়ী। ভারতবাসীদের অশিক্ষা, অধঃপতন এবং অবনতির জন্য ভারতবাসীরাই দায়ী। এবং সেই অধঃপতন ও অবনতির কারণ সমুদয় বিদূরিত করিয়া ভারতে শিক্ষা বিস্তার করাও ভারতবাসীদেরই কর্ত্তব্য। এদেশের অশিক্ষা, অধঃপতন এবং সর্ব্বপ্রকার অবনতির জন্য আমরা দায়ী এবং সেই অধঃপতন এবং অবনতির কারণ সকল দূরীভূত করিয়া অচিরে ভারতের নিরক্ষরতা দূর করাও আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব কিরূপে এখন এ ভারতে শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা চিন্তা করাই বর্ত্তমানে ভারতের সুধীবৃন্দের কর্ত্তব্য। ভারতের অশিক্ষার জন্য ভারতবাসীরা দায়ী, অতএব শিক্ষা বিস্তার করিয়া ভারতের নিরক্ষরতা বিদূরিত করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য এবং কি প্রকারে তাহা করা যাইতে পারে, সেই চিন্তা করাই ভারতের সুধীবৃন্দের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। মোটের উপর কথা এই,—অশিক্ষার জন্য আমরা দায়ী। শিক্ষা বিস্তার করা আমাদের কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য পালনে আমরা সক্ষম কি না?

দায়ী আমরা, কর্ত্তব্য আমাদের। কিন্তু এই কর্ত্তব্য পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর কি না? এবং আমরা সক্ষম কি না?

গত স্বদেশী আন্দোলন আমাদিগকে অনেকগুলি বিষয় সম্বন্ধে ভাবিতে এবং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে শিখাইয়াছে। এই

আন্দোলনের ফলে আমরা অনেকগুলি কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম। শিল্পের উন্নতিকল্পে কতকগুলি কলকারখানার সংস্থাপন এবং শিক্ষাবিস্তারের উন্নতির জন্য জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের সংস্থাপন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চেষ্টার একটীতেও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। শিল্পোন্নতির জন্য যে সমুদয় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই আজকাল অস্তিত্বশূন্য-প্রায় হইয়া গিয়াছে, আর তাহাদের বিষয় বড় একটা কিছু শুনা যায় না। আর জাতীয় শিক্ষা-সমিতি বা শিক্ষা-সভা (National Council of Education) সম্বন্ধেও তদ্রূপ। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে সমুদয় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আজকাল স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অনুসন্ধানার্থ গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত প্রতিনিধি সুযোগ্য সিভিলিয়ান মিঃ জে, এ, এল্, সোয়ান, বিশেষ শ্রম স্বীকার করত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিগত ৩১শে ডিসেম্বর গভর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন এবং যাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য গত ১৭ই এপ্রিল হইতে গভর্ণমেণ্ট এক একখানা সমুদয় খবরের কাগজওয়ালাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ প্রকাশ:— স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এদেশে যে কয়টী কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই অস্তিত্বহীন। যে কয়টী আছে, তাহাও কণ্ঠাগতপ্রাণ। অকৃতকার্য্যতার কারণ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন, এবং পরিশেষে প্রধান দুইটী

কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার একটী মূলধনের অল্পতা, এবং অপরটী পরিচালন কার্য্যের ত্রুটীবহুলতা। প্রথমোক্ত কারণটীর সত্যতা-সপ্রমাণার্থে মিঃ সোয়ান যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ;—একটী কোম্পানী চারিলক্ষ টাকা মূলধন সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই চারিলক্ষের মাত্র ৮৫,০০০ পঁচাশী হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, এবং এই স্বাক্ষরিত পঁচাশী হাজারের ৬৫,০০০ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা কেবল আদায় হইয়াছিল। কিন্তু কোম্পানী এই সামান্য মাত্র টাকা লইয়াই কলকব্জা কিনিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু শেষে টাকার অভাবে এমন হয় যে, কাজ আর কিছুতেই চলে না। তখন কোম্পানী উচ্চহারের সুদে টাকা ধার করেন। ফলে লাভ আর কি করিয়া হইবে? কোম্পানী লাভের অংশ দিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, লোকে এই কোম্পানীর সেয়ার কেনাও বন্ধ করিয়া দেয়, এবং ফলে এই কোম্পানী ঋণজালে জড়িত হইয়া অকালেই পঙ্গু হইয়া পড়ে। মিঃ সোয়ানের রিপোর্টে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আরও আছে। এই সকল কোম্পানীর অবিবেচনা এবং অকৃতকার্য্যতার ফলে এদেশে এখন এমন হইয়াছে যে, লোকে আজকাল স্বদেশীর নাম শুনিলেই ভীত হয় ও ঘৃণা করে। মিঃ সোয়ান লিখিয়াছেন,—"There are, at present, no signs that Indian capital is likely, in the near future, to be freely invested in industrial Enterprises." অর্থাৎ শিল্পবাণিজ্যবিষয়ক কোনও কাজে এদেশীয়

লোক যে শীঘ্র স্বচ্ছন্দে মূলধন দিবে, এরূপ কোন লক্ষণই এখন দেখা যায় না। দেশে যাঁহাদের হাতে টাকা আছে, তাঁহারা যেহেতু অন্য কাজে টাকা খাটাইয়া বেশী লাভবান্ হন, তখন এ সকল ব্যাপারে তাঁহারা এখন একবারে মিশিতেই চাহেন না।

প্রথমটী, অর্থাৎ মূলধন সম্বন্ধে এই কথা। তাহার পর, শেষেরটী অর্থাৎ পরিচালন সম্বন্ধে যেরূপ বক্তব্য, তাহা এইরূপ,—যাঁহারা কার্য্য-পরিচালন ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনেকেই নিজে হাতে-কলমে কাজ করিতে জানেন না, আর তাঁহাদের উপদেশ পাইবারও অন্য কোনও উপায় নাই। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি বাণিজ্যপ্রধান দেশে ব্যবসায় কোম্পানী সমূহকে কার্য্য-পরিচালন সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য হাতে-কলমে শিক্ষিত বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত কয়েকজন বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত, একটী করিয়া "বোর্ড অব্ ডিরেক্টার্স্' আছে, এদেশে তেমন নাই। মিঃ সোয়ান বলিয়াছেন,—"এদেশে এ শ্রেণীর লোকের একান্ত অভাব, তাই, এদেশীয়ের পরিচালিত ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থাও শোচনীয়।" তবে এদেশী লোক যে একবারেই ব্যবসায় বুদ্ধিহীন—এ কথা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস', 'বেঙ্গল গ্যাল্‌ভানাইজিং ওয়ার্কস্' এমন পুষ্টিলাভ করিতে পারিত না, আর, 'ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস্', 'ন্যাসন্যাল ট্যানারী' প্রভৃতি এতদিন টিকিতে পারিত না। কথাটা কি, শুধু হাওয়া বা হুজুগের উপর কোন কিছু হঠাৎ গঠিত হইতে পারে না; শক্ত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার।

তারপর শেষ কথা এই যে, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা দরকার। সামান্ত সহানুভূতিও এ বিষয়ে বহু মূল্যবান্। অনেক স্থানে গভর্ণমেণ্ট পকেটের পয়সা দিয়া দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। এখানে যদি গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি-সাহায্য যথেষ্ট প্রকারে প্রদান করেন, স্থানীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি কিয়ৎপরিমাণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশী লোকে ভরসা পাইবে এবং টাকাও দিতে আরম্ভ করিবে। এ সম্বন্ধে মিঃ সোয়ানের মত তাই। তিনিও লিখিয়াছেন,—Government patronage might be extended more freely than at present to articles of local manufacture অর্থাৎ স্থানীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এখন যে পরিমাণে পোষকতা করেন, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে করা উচিত।”......ইত্যাদি।

মিঃ সোয়ানের এই রিপোর্ট হইতে আমাদের উপযুক্ততা সম্বন্ধে এইরূপ অভিমতই পাওয়া যাইতেছে, এবং তাঁহার এই মত যে সত্যতা-শূন্য একথা কিছুতেই বলা যায় না। হাতে-কলমে শিক্ষিত, বিশেষরূপে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে এদেশে অতি বিরল তাহাতে আর সন্দেহ কি! মূল অভাবই ত সেইটী এবং আজ পর্য্যন্ত এদেশ সেইটী যে জন্মাইতে পারে নাই, দুঃখই ত তাই! আমরা হাতে-কলমে শিখিবার সুবিধা পাই নাই, দেশে সেরূপ সুবিধাও নাই, কাজে কাজেই হাতে-কলমে শিখিয়া বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমরা বিশেষজ্ঞ হইতে পারি নাই—

আমরা অনুপযুক্ত, সুতরাং কার্য্যপরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে পরিচালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, আমরা অকৃতকার্য্য হই, মিঃ সোয়ানের এ কথা অন্যায় কিংবা অযৌক্তিক নহে, অতি ঠিক। এবং একথাও একই প্রকার ঠিক যে, বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার অভাবে, বৈজ্ঞানিক বিষয় হাতে-কলমে শিখিবার সুবন্দোবস্ত না থাকাই এদেশী লোক ইচ্ছা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে উপযুক্ত হইতে বা উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কেননা, বিজ্ঞানই শিল্প-বাণিজ্যের প্রসূতি। বিজ্ঞান শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না হইলে, বিজ্ঞানে বহুদর্শিতা লাভ করিতে না পারিলে, বৈজ্ঞানিক বিষয় হাতে-কলমে শিখিবার সুবিধা না পাইলে, এবং হাতে-কলমে শিখিতে না পারিলে, দেশে কখনও শিল্প-বাণিজ্য সমুন্নত হইতে পারে না। আমাদের সে সব সুবিধা নাই, আমরা হাতে-কলমে শিখিয়া বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বিশেষজ্ঞও হইতে পারি না, কার্য্যপরিচালনভার গ্রহণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি না। দোষ কাহার? অবশ্য আমাদের।

এই পর্য্যন্ত হইল আমাদের শিল্প-বাণিজ্যে কার্য্যপরিচালন-ক্ষমতা সম্বন্ধে। এখন দেখা যা'ক, জাতীয় শিক্ষা সভা (National Council of education) সংস্থাপনে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি।

এখানে কি দেখিতেছি? জাতীয় শিক্ষামন্দির এখন কিরূপ? আজ কা'ল ইহার কি অবস্থা, কিরূপ ভাবে চলিতেছে?

কতদূর অগ্রসর? কেমন? মুমূর্ষু, মৃতপ্রায় কোন কিছু যেন অসার অবস্থায় পড়িয়া আছে; যেন অতি শীঘ্রই প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইবে; যেন অতি কষ্টে শেষকালের শেষ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস টানিতেছে ও ফেলিতেছে? যেন আর অতি অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে, যেন অধিকক্ষণ এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া অসারত্বের পরিচয় দিতে একেবারেই নারাজ! কিছুকাল পরেই যেন প্রাণশূন্য দেহখানি পড়িয়া থাকিবে। এ মাত্র কয়েক দিনের কথা! কি দুঃখের কথা! কি শোচনীয় শোকগাথা! কি প্রাণপর্শী স্মৃতি! জাতীয় শিক্ষামন্দিরের দিকে বারেক তাকাইলে ঠিক এমনই মনে হয়। ক্ষণেকের মধ্যে একে একে কত কথা বলিয়া দেয়! কত অল্প সময়ের মধ্যে কেন যেন এত বড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হয়! কেন? কি নাই? কিসের অভাব?

আর, তার পর, শেষে, তদন্তর্গত "বেঙ্গল টেক্‌নোলজি"! কি বিরাট দৃশ্য! কি বিপুল আয়োজন! কিন্তু বিশাল মহীরুহের পতন! দেখিলে বুকটা ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণটা উদাস হইয়া যায়, এবং অচিরেই মাথাটা ঘুরিতে থাকে! কি হৃদয়বিদাকর দৃশ্য! হায়রে, বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্যই বটে! তাই এমন ভরা নৌকা ডুবিয়া যায়; তাই এমন বিশাল ফলবান্ বৃক্ষের অকালে পতন হয়! না হইলে কি বাঙ্গালার ভাগ্যে এমন হয়? না হইলে কি এমন সাধের স্থানটী শ্মশানে পরিণত হয়? এমন সাধের জিনিসটী ভাঙ্গিয়া যায়? এমন সাধনার ধনটী হারাইয়া যায়? হায়রে কপাল! কি

করিয়া বলা যায়, বঙ্গবাসীদিগের দ্বারা ভগবানের আর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার রহিয়াছে? কিন্তু কি দুঃখেরই কথা! হৃদয় ফেটে নিঃশ্বাস বাহির হয়। কেন? কি নাই? কি চাই? কিসের অভাব? কেন এমন হইল? যাহার প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় সমগ্র বঙ্গদেশ একদিন উৎকণ্ঠিত প্রাণে অপেক্ষা করিতেছিল এবং যাহার প্রতিষ্ঠা করিতে একদিন সমস্ত বঙ্গবাসী অপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন, আর যাহার প্রতিষ্ঠায় এই বাঙ্গালা দেশ ধন্য হইয়াছিল, আজ কেন তাহা এমন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে? আজ কেন তাহা অতি শোচনীয় অবস্থায় মুমূর্ষুর ন্যায় প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে? আজ কেন তাহা এমন ভাবে ধ্বংসের মুখে দাঁড়াইয়া অতীতের স্মৃতি রক্ষার প্রয়াসে প্রতীক্ষা করিতেছে? কেন? কি নাই? কিসের অভাব? যাহা একদিন এত আনন্দ দান করিয়াছে, আজ কেন তাহা কেবল মাত্র উষ্ণনিঃশ্বাসের আধার হইতে বসিয়াছে? কি অভাব? কি নাই? কি চাই?

চাই একটী মাত্র জিনিস, সেটী উপযুক্ততা। একটী উপযুক্ত লোকের অভাবে তেমন একটী অসাধারণ কারবার কর্ণধারবিহীন বৃহৎ তরণীর ন্যায় অকূলে ডুবিয়া যায়। একটী উপযুক্ত হস্তের অভাবে একটী অসামান্য বিষয় পণ্ড হইয়া যায়। একটী উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে সেনানীবৃন্দ স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া উঠিয়া যে যাহার প্রাধান্যতা বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়া আপন মতলব মত চলিতে থাকে এবং অবশেষে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যখানি

বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া ফেলে। উপযুক্ত লোকের অভাবেই প্রায় সব সময়ই অনুপায় উপস্থিত করিয়া থাকে। উপযুক্ত কর্ত্তার অভাবে একখানি সোনার সংসার ছারখার হইয়া যায়, একজন উপযুক্ত ব্যবসায়ীর অভাবে বা অবর্ত্তমানে তেমন একটী লাভবান্ ব্যবসায়েও লোক্‌সান হইতে থাকে বা গড়িয়া উঠিতে পারে না। উপযুক্ত সম্রাটের অভাবে সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য। কত দেখাইব, কত বলিব? এরূপ কত রহিয়াছে! অতএব আমাদের এই অনুষ্ঠান যে এমন দশায় পতিত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু বড়ই দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়! বড়ই মর্ম্মান্তিক!

কারণ উপযুক্ততার অভাবে অনৈক্যের উদ্বোধন। উপযুক্ত লোকের অভাবে দলভুক্ত বা কার্য্যে নিযুক্ত অন্য সমুদয় লোক স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়ে, এবং যে যাহার প্রাধান্যতা বজায় রাখিবার জন্য বা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন স্বার্থ-সিদ্ধির কারণে আপন মতলব অনুযায়ী কথা বলিয়া থাকে এবং কাজ করিয়া থাকে; তখন তাহারা আর মূল বিষয়ের দিকে ভুলিয়াও তাকায় না, কিরূপে মূলের মঙ্গল হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তখন আর তাহারা একবারও লক্ষ্য করে না, মূল বিষয়ের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিবার আর তাহাদের অবসর থাকে না, তাহারা তখন কেবল স্বমতলব বজায় রাখিবার জন্য তদনুরূপ কাজ করিয়া থাকে, এমন কি মূলবস্তু মূলোচ্ছেদ হইয়া অধঃপতিত হইয়া যা'ক, তাহাতে তাহারা কোনওরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করে না, কেবল তাহাদের স্বমত বজায় থাকিলেই হইল। বাস্তবিক এরূপ

ব্যাপারে হয়ও তাই, স্ব স্ব প্রধান লোকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে মূল বিষয়টীর অধঃপতন হয়, স্বেচ্ছাচারিগণও শেষে সুখে 'রাম রম্ভা' ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

উপযুক্ত লোকের অভাব, বাস্তবিক এমনই গুরুতর! উপযুক্ত লোকের অভাবে কত সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে, কত বিপুলবাহিনী বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত বিশাল ব্যবসা ক্ষেত্র একবারে বিনাশ হইয়া যাইতেছে, কত বিরাট্ ব্যাপার বিষম বিপদে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের ফল 'জাতীয় শিক্ষা সমিতি'র এমন দশা হইবে, শিক্ষা-মন্দিরের দ্বীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইবে, সে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাহাতে আর বিস্মিত হইবার এমন কি রহিয়াছে? তবে দুঃখিত ও লজ্জিত হইবার অবশ্য অনেকই আছে। কারণ, আমাদের অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত আমাদের মধ্যে উপযুক্ত লোকের অভাব হেতু এত সাধ এবং সাধনার সামগ্রী এমন দশায় উপনীত হইল, ইহা কি অতিশয় দুঃখের বিষয় নয়? আর, আজ এই বর্ত্তমান সময়ও আমরা "অনুপযুক্ত," আজ এই দিনেও আমাদের মধ্যে "উপযুক্ত লোকের অভাব" ইহা কি লজ্জার কথা নয়? এই কথা স্বীকার করিতে কি এখন আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত নয়? এই বিংশ শতাব্দীতেও কি আমাদের এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়?

যাহাই হউক, স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সাধন উদ্দেশ্যে নানারূপ কল-কারবারের প্রতিষ্ঠায় এবং জাতীয় শিক্ষা মহাসভার

সংস্থাপন এ উভয় কার্য্যেই আমাদের অকৃতকার্য্য হইবার মূলে আমাদের একই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, উভয় কার্য্যই আমাদের মধ্যে উপযুক্ত লোকের অভাব, ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে। এ উভয় কাজই আমারা এখনও উপযুক্ত হইতে পারি নাই, ইহাই বলিয়া দিতেছে। অনুপযুক্ততা নিবন্ধনই প্রতিবার প্রতি কার্য্যে আমরা অকৃতকার্য্য এবং পতিত হইতেছি। অনুপযুক্ততাই একমাত্র কারণ। আমরা এখনও অনুপযুক্ত, উপযুক্ত নই।

কিন্তু আমরা কি উপযুক্ত হইতে পারি না? আমরা কি মানুষ নই? কত অসভ্য, অধম, অধীন জাতি শিক্ষা পাইয়া উপযুক্ত হইল ও উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইল, কত বোকা বিড়ম্বনাপ্রদ বর্ব্বর-বাহিনী শিক্ষায় সমুন্নত হইয়া উপযুক্ততার প্রমাণ দিল, আর আর্য্যবংশধর আর্য্য আমরা শিক্ষার অভাবে অনুপযুক্ততা নিবন্ধন আজ এই এমন দশায় অধঃপতিত! আর্য্য-শোণিত এখন কি আর আমাদের ধমনীতে বহে না? আর্য্য-নিবাস ভারতভূমি কি এখন আমাদের বাসস্থান নয়? আর্য্যকীর্ত্তি—আর্য্যগৌরবগাথা কি একবারে আমরা স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি যে, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা আমাদিগকে অনুপযুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হই না? অথবা, দূরে যা'ক সে সব পুরাণ কথা—আমরা কি মানুষ নই? মানুষের ঔরসে, মানুষের বীর্য্যে, মানুষের গর্ভে কি আমাদের জন্ম নয়? আমরা কি মানবীয় জন্ম-প্রক্রিয়ায় জন্ম-

গ্রহণ করি নাই? আমরা কি মানুষ নই? আমরা কি অন্য মানুষে যাহা করিতে পারে ও অন্য মানুষে যাহা হইতে পারে, তাহা আমরা পারি না? আমরা কি এমনই অধম হইয়া পড়িয়াছি? আমরা কি জগতে উপযুক্ত ও উন্নত হইতে পারি না?

আমরাও মানুষ। সর্ব্বপ্রকার মানবীয় উপকরণ, প্রকরণ এবং প্রক্রিয়ায় গঠিত আমরাও মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, আমরাও মানুষ। সুতরাং এ দুনিয়ায় মানুষে যাহা কিছু করিতে সক্ষম হয়, আমাদের পক্ষেও তৎসমুদয়ে সক্ষম হওয়া সম্ভবপর। অন্যে যাহা করিতে সক্ষম আমরাও যত্ন করিলে অবশ্য তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। অন্যের পক্ষে যাহা করা সম্ভবপর হইয়াছে, আমাদের পক্ষেও তাহা অসম্ভব নয়, অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরাও মানুষ।

আমরা মানুষ। আমাদেরও উপযুক্ত হইয়া মানুষের মত কাজ করা উচিত। আর যাহা উচিত, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের মানুষের ন্যায় নিজের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদয় এক একটী করিয়া সম্পন্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরাও মানুষ, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মক্ষম হইয়া স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা নিজের দায়িত্ব নিজে লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তাহা আমরা অবশ্য করিব।

আমাদের অশিক্ষা, আমাদের অনুপযুক্ততা এবং আমাদের এই অধঃপতিত অবস্থার জন্য আমরা দায়ী। যেরূপে শিক্ষা বিস্তার হইতে পারে, যাহাতে আমরা উপযুক্ত হইতে পারি এবং

যে প্রকারে হউক এই অধঃপতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারি, তৎসমুদয় করা আমাদের কর্ত্তব্য। এবং যেহেতু এই সমস্ত আমাদের কর্ত্তব্য, সুতরাং করিতেই হইবে। যাহা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে।

কিন্তু, কি করিয়া করিব? কি করিয়া এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব? কিরূপে এত বড় বড় কর্ম্ম সমুদয় আমরা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতে পারিব? ইহা কি আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব?

মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। মানুষের অসাধ্য কিছু আছে এযাবৎ এমন কিছু শুনা যায় নাই। মানুষের অসাধ্য কিছু নাই। আমরাও মানুষ, সুতরাং মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভবপর, আমাদের পক্ষেও তাহা অবশ্য সম্ভবপর হইবে। অন্যে যাহা করিতে পারিয়াছে, কি পারে, আমরাও তাহা অবশ্য পারিব, অবশ্য করিব। কিন্তু কি উপায়ে তাহাই এখন একমাত্র ভাবিবার বিষয়। কি উপায়ে আমারা কর্ত্তব্য সমুদয় পালন করিতে সক্ষম হইব, তাহাই একমাত্র বিবেচ্য বস্তু। কিরূপে ভারতে শিক্ষা বিস্তার করিয়া নিরক্ষরতা দূর করা যায়? কিরূপে আমরা উপযুক্ত হইতে পারি? কিরূপে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিয়া নিজের পায়ের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এই অধঃপতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার হইতে পারি?

তাহা হইলে, এখন আমাদের সর্ব্বপ্রথমে দ্রষ্টব্য কিরূপে এদেশ

এই অবস্থা হইতে উদ্ধার হইতে পারে? কিসে এদেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে? এবং কোন্ অবস্থাকে উন্নত অবস্থা বলিব?

দেশের লোক যখন, দেশের যে অবস্থায় স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে সক্ষম হয়, তখন দেশের সেই অবস্থাকে, লোকে দেশের উন্নত অবস্থা বলিয়া থাকে। অবশ্য মানবের সুখ দুঃখ প্রত্যেকের স্ব স্ব কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করে। তবে দেশের লোকের, দেশের শিক্ষিত সমাজের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা এইরূপ কতকগুলি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন যে, যাহাতে দেশের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদিগের কাজের অভাব হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম ও কার্য্য করিতে প্রস্তুত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যদি উপযুক্ততা অনুসারে কর্ম্ম পাইতে পারে, দেশে যদি এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় তবেই তাহাকে দেশের উন্নত অবস্থা বলিব।

বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা বড় শোচনীয়। অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই হা অন্ন, হা অন্ন, রব সমুত্থিত। অধিকাংশ লোকেই নিশ্চিন্ত-ভাবে এক সন্ধ্যা আহার করিতে অসমর্থ। দেশের এই অবস্থা বড়ই সাংঘাতিক, বড়ই ভয়াবহ।

দেশের অবস্থা এইরূপ হইবার কারণ কি? এইরূপ অবস্থা হইবার কারণ আর কিছুই নহে, শিল্প বাণিজ্যের অভাবই এদেশের এই অবস্থার উপনীত হইবার একমাত্র কারণ। পূর্ব্বে যখন দেশ শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত ছিল, তখন দেশের এই অবস্থা ছিল না, দেশের লোক এরূপ হা অন্ন, হা অন্ন, করিয়া অস্থির হইত না।

তাহাদের ঘরে খাবার ছিল; সুতরাং প্রত্যেক ঘরে ঘরে সুখ-শান্তি সর্ব্বদা বিরাজ করিত। লোক নির্ভাবনায় প্রাণ ভরিয়া কাজ করিত। আর আ'জ কা'ল দেশের লোকের শতকরা ৮৫ জনের উপর কেবল একমাত্র কৃষি-কার্য্যের উপরে জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমুদয় লোক অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত, আজ তাহারাও অন্য উপায় না থাকায়, ও না দেখায়, এই একমাত্র কৃষি-বিভাগে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; তাই কৃষি-বিভাগ আজ এমন লোকে লোকারণ্য হইয়া অতি ভারাক্রান্ত পড়িয়াছে; কৃষিতে আর কুলায় না। এক কৃষি আর কত কুলাইবে? তাই দেশের আজ এ অবস্থা! অতএব দেখা যায়, দেশের অবস্থা ফিরাইতে হইলে, কৃষি-বিভাগের বোঝা কমান নিতান্ত দরকার। এই শতকরা পঁচাশীর পঁয়তাল্লিশ জনকে অন্য দিকে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এবং তাহা করিতে হইলেই শিল্প-বাণিজ্যের সংস্থাপন, কল-কারবারের প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। আর তাহা করিতে পারিলেই দেশের অবস্থা ফিরিল—দেশ উন্নত হইল।

কিন্তু এই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে কল-কারবারের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের উপযুক্ত হওয়া দরকার। তাহা না হইলে স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে এতাবৎ কাল যেরূপ হইয়া আসিয়াছে, অতঃপরও সেইরূপই হইতে থাকিবে।

কিন্তু উপযুক্ত হইবার উপায় কি? কি উপায়ে আমরা উপযুক্ত হইতে পারি? কোন্ পথে আমরা উপযুক্ততা লাভ করিতে পারি? কিরূপে উপযুক্ত হওয়া যায়? উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উপদেশ অনুযায়ী হাতে-কলমে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে উপযুক্ত হওয়া যায়। অথবা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কেবল কাজ করিতে করিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও উপযুক্ত হইতে পারা যায়। আর তাহা না হইলে, কল্পনানুযায়ী কার্য্যারম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ ফেল্ করিতে করিতে শেষে পাশ করা অর্থাৎ পড়িতে পড়িতে হাঁটিতে শেখা। বারংবার অকৃতকার্য্য হইতে হইতে শেষে কৃতকার্য্যতা লাভ করা। কিন্তু শেষোক্ত পথ অবলম্বন করা অভিপ্রেত নহে; কারণ, ইহাতে অনেক সময় লোকের আস্থা হারাইয়া হতাশ হইতে হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে সমুদয় কল-কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের অকৃত-কার্য্যতা এবং তাহার যে ফল, তাহাও এইরূপই বটে।

দ্বিতীয় পথ, কার্য্যক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া উপযুক্ত হওয়া। এই পথও এদেশে অতি অপ্রশস্ত। কার্য্যক্ষেত্রের সংখ্যা এখানে অতি কম। কারণ উপযুক্ত লোকের অল্পতা। উপযুক্ত লোক থাকিলে তো কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে? উপযুক্ত লোক নাই তবে কার্য্যক্ষেত্র কে প্রস্তুত করিবে? অতএব কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া উপযুক্ত হওয়ার আশাও এদেশে অতি কম।

প্রথম অথবা শেষ উপায় হইল উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উপদেশ অনুযায়ী হাতে কলমে কাজ করিয়া উপদেশ ও অভিজ্ঞতা উভয় লাভ করিয়া উপযুক্ত হওয়া। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথও বটে। এই উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কিছুই নহে, যেখানে উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লাভের বন্দোবস্ত বর্ত্তমান। ইহা ইউনিভারসিটি। কিন্তু আমাদের দেশে এইটারও অভাব। ইউরোপ কিংবা আমেরিকার ইউনিভারসিটিগুলি যেন এক একটী ছোট রকমের পৃথিবী; এখানে সব রকমের জিনিসই আছে। উপদেশ ও অভিজ্ঞতা উভয় লাভেরই উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। সে সমুদয়ে শিক্ষা লাভ করিলে, অনায়াসে উপযুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু এদেশী ইউনিভারসিটিগুলি এক দিকে ঐ সমুদয় অপেক্ষা নিম্নস্তরের—উপদেশের অভাব ত রহিয়াছেই, তারপর, হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভের বন্দোবস্ত একেবারেই নাই। অতএব দেখা যায়, আমাদের ভাগ্যে সব পথই অপ্রশস্ত। কোনও পথেই ইচ্ছা মাত্রেই অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কিন্তু তবে কি হইবে? কি উপায়? কোন্ পথে অগ্রসর হওয়া উচিত? কোন্ পথে যাইতে পারি? কোন্ পথ সুগম? কোন্ পথ অপেক্ষাকৃত পরিস্কার? কোন্টী অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর? স্বদেশীতে লোক আর সুখানুভব করে না, সুখানুভব করা দূরের কথা, ইহাতে আর দেশের লোকের আস্থাই নাই। সুতরাং ইহাতে আর দেশের লোকে টাকা দিতে চায় না। কাজে কাজেই ফেল হইতে হইতে পাশ হইবার সুযোগ আর এখন নাই।

কল্পনানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিয়া অকৃতকার্য্য হইতে হইতে অবশেষে কৃতকার্য্যতা-লাভ করিবার আশা আর নাই। এ পথ আর এখন অবলম্বন যোগ্য নহে। অতএব এ পথ এখন পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় পথ, কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে করিতে অভিজ্ঞতা'লাভ করিয়া উপযুক্ত হওয়া। সে সুবিধাও এদেশে অতি বিরল। কার্য্য-ক্ষেত্রই নাই, কাজ করিবে কোথায়? অভিজ্ঞতাই বা কিরূপে লাভ করিবে? অতএব এখানেও আমরা অসহায়। তৎপর তাহা হইলে এক মাত্র তৃতীয় পথ অবশিষ্ট, এইটীই যদি কেবল অবলম্বন করিতে পারি, তবেই উপায় হয়, নচেৎ নহে। ইহার অনুষ্ঠান মাত্র আছে, কিন্তু উপযুক্ত উপদেশ দিতে অসমর্থ। আর ইহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবিধা একেবারেই নাই। সুতরাং এ পথও সুপ্রশস্ত নহে। তবে যদি ইহাকে সেরূপ অবস্থায় আনয়ন করা যাইতে পারে, যাহা হইলে ইহা আমা-দিগকে উপযুক্ততা দানে সক্ষম হইতে পারে, তাহা হইলেই একমাত্র উপায়ের সম্ভাবনা, নতুবা আর কোন উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু কি উপায়ে ইহাকে সেই অবস্থায় আনয়ন করা যাইতে পারে? কি করিলে ইহা আমাদিগকে উপদেশ এবং অভিজ্ঞতা প্রদান করিবার মত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়? কিরূপে ইহাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করা যাইতে পারে? এ দেশীয় ইউনিভার্সিটিগুলি যদি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিত, অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট যদি এখন অনুগ্রহ করিয়া এগুলিকে তদ্দশা দান করিতে পারিতেন, তবে এ পথ অতি সহজেই সুগম হইতে

পারিত, এদেশী ইউনিভার্সিটিগুলি যদি বিলাতী কিংবা আমেরিকার ইউনিভারসিটির মত হইতে পারিত, এ দেশী এক একটী ইউনিভার্সিটি যদি ছোট ছোট পৃথিবীতে পরিণত হইতে পারিত; তবে আনন্দের অবধি থাকিত না। কিন্তু হায়, আমাদের সেই আশা কি আর এই দুর্দ্দিনে পূর্ণ হওয়ার কোনও ভরসা করা যায়?

স্বদেশী আন্দোলনের সময় শিক্ষার সুবিধার জন্য সাহসী হইয়া আমরা জাতীয় শিক্ষা-সভার সংস্থাপন করিয়া ছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে অনেকগুলি জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্রেরও সংস্থাপন আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এখন মূলের অস্থায়িতার আশঙ্কা অনুভব করায় সে সব গুলি আস্তে আস্তে অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মূল বৃক্ষ যদি 'টলমল' করে, শাখা প্রশাখা তাহা হইলে আর টলিবে না কেন?

যাহাই হউক, এই "জাতীয় শিক্ষা সভার" এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবার প্রধান কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু আরও যে সব কারণ বর্ত্তমান, তন্মধ্যে, একটী অতি গুরুতর। ইহা আর কিছুই নহে, ছাত্রের অভাব। এই অভাব ইউনিভার্সিটির সংস্থাপন করার পক্ষে অতি সাংঘাতিক এবং অতি মারাত্মক। ইউনিভার্সিটি সংস্থাপিত হইল, কিন্তু তাহাতে যদি ছাত্রসমাগম যথেষ্ট না হয়, পড়ুয়া যদি সেখানে পড়িতে না যায়, অভিভাবকগণ যদি তাঁহাদের ছেলেদিগকে সেখানে পড়িতে দেওয়া সঙ্গত বোধ না করেন,—সেখানে যদি

না পাঠান, তবে ইউনিভার্সিটি কিরূপে দাঁড়াইতে পারে? কতক্ষণ ইউনিভার্সিটি এই এবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাভাবের কারণ কি?-

কিন্তু জাতীয়-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রাভাবের কারণ কি? যাহার প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ উৎকণ্ঠাবস্থায় অপেক্ষা করিতেছিল, বাঙ্গালার যুবকবৃন্দ আজ সেখানে যাইতে এরূপ অপ্রস্তুত কেন? আজ তাহারা জাতীয় শিক্ষামন্দিরে আগমন করিতে এ প্রকার অসম্মত কেন? আজ কেন "জাতীয় শিক্ষাগৃহ" শূন্যপ্রায় হইতে চলিয়াছে? যে 'ন্যাশন্যাল ইউনিভারসিটি' প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালীরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিল, আজ সেই বাঙ্গালী অভিভাবকগণ আপন আপন সন্তানগণকে সেই সাধের "জাতীয় শিক্ষা-মন্দিরে" প্রবেশ করিতে দিতে অপ্রস্তুত কেন? কি কারণ? কেন?

এ জগতে ধনী কি নির্ধনী সকলেই আপন আপন সন্তানগণের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখিতে চায়। সন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে সুখে অতিবাহিত হইতে পারে, সকলে যথাসম্ভব সে চেষ্টা করিয়া থাকে। কে আপনার পুত্রের অদৃষ্ট অন্ধকার করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে? কাহার না ইচ্ছা হয় যে আপনার সন্তানের জন্য যদি পারে তবে স্বর্ণ সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া যায়? কে আপনার পুত্রের ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রাখিয়া সন্তুষ্ট হয়? বোধ

হয় এ জগতে এমন কেহই নাই। "জাতীয়-শিক্ষা-মন্দিরের" স্থায়িত্ব সম্বন্ধে লোকে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা মন্দির দাঁড়াইয়া থাকিবে, কি ইহার অস্তিত্ব আস্তে আস্তে খসিয়া পড়িবে, তাহা কেহই এখন বলিতে পারে না; 'জাতীয়-শিক্ষা-সভার' স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছেন। কাজে কাজেই এমন কি নেতৃবৃন্দও তাহাদিগের পুত্র ও নাতিবৃন্দকে আর এখানে পাঠাইতে কিংবা পড়াইতে সাহসী হন না। যদি ঘটনা এইরূপই হয় কিংবা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাহিরের লোকে কোন্ ভরসায়, আর কোন্ সাহসে এখানে তাহাদের ছেলেদিগকে পড়িতে পাঠাইবে? কে সাধ করিয়া আপনার সাধনার সামগ্রী বাছনীকে অনির্দিষ্টের ক্রোড়ে অর্পণ করিতে চায়? কে পুত্র রত্নকে তথায় পাঠাইয়া তাহার ভাগ্যাকাশ ঘোর অন্ধকারাবৃত করিতে প্রয়াস পাইতে চায়? কাহার ইচ্ছা এখানে পাঠাইয়া অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার সন্তানের জীবনের উন্নতির মূলে শঙ্কা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়া যায়? কেহই না। অতএব কেহই এখানে প্রেরণ করিতে চায় না, পাঠায় না। তাই জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বেঙ্গল টেক্‌নোলজির মত সুখের সামগ্রী আজ এমন প্রাণশূন্য দেহের দশায় পরিণত হইয়াছে। উপযুক্ত লোকের অভাবে বঙ্গের এমন আদরের সামগ্রীর স্থায়িত্ব সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছে। উৎসাহী ছাত্রসমূহ আজ অশান্ত ও অধীর হইয়া পড়িয়াছে এবং পলাই-বার পথ দেখিতেছে।

আরও এক কারণ আছে যাহা ঠিক এই প্রকারই গুরুতর। লোকে এখানে পড়িতে আসিবে কোন্ আশায়? এখানে পড়িয়া কি হইবে? এখান হইতে পাশ করিলে কি লাভ? কি চাকরী জুটিতে পারিবে? এখান হইতে পাশ করিলে গভর্ণমেণ্টের চাকরী পাওয়া যাইবে কি না? এখানকার পাশের মূল্য কি? এখানকার পাশের বিশেষ কোনও বিশেষত্ব আছে বা থাকিবে কি না? এবং সেইটুকুর বিশেষ কোনও মূল্য আছে কি না? চাকরীর দরে ইহার দাম কত? কেহ কিনিবে কি না? যদি এখান হইতে পাশ করায় গভর্ণমেণ্টের চাকরীর দাবী করা না যায়, যদি গভর্ণ-মেণ্টের চাকরী না পাওয়া যায়, যদি ইহার আর কোনও বিশেষত্ব না থাকে, এবং তাহার মূল্য না থাকে, তবে ইহার দাম অতি অল্প। যদি তাহাই হয়, তবে, আজকালের এই দিনে, এত অর্থব্যয় করিয়া, এই অল্প দামের মাল খরিদ করিয়া, কি লাভ? কেন বহুমূল্যে পচা মাল কিনিব? তারপর এই অর্থ ব্যয় তো অল্প কথা, ইহার পর আবার নিরর্থক বহুমূল্য সময় ব্যয় করা আরও ভয়ানক। অকারণ কে ইহা করিতে চায়? বিশেষ কিছু না থাকিলে কেহই না। সুতরাং জাতীয় শিক্ষা-মন্দিরেও আর সেরূপ ছাত্র-সমাগম দেখা যায় না। ইহাও জাতীয় শিক্ষা সভার এই শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করার আর একটী কারণ।

জাতীয় শিক্ষা সভাকে গভর্ণমেণ্ট কোন একটা কিছু স্বীকার করেন না। চাকরী গ্রহণ করিতে হইলে, ইহার সার্টিফিকিটের বড় বেশী একটা মূল্য দেখা যায় না। এখানে পড়িয়া এমন

কোন বিশেষত্বও লাভ করা যায় না। ইহাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে গঠিত ও অনুপ্রাণিত। অতএব এখানে এবং সেখানে শিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, উভয়ই একরূপ, অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। ইহাই যদি ঠিক, তবে লোক সেখানে না যাইয়া এখানে আসিবে কেন? কি লাভের জন্য? শুধু ভাব জগতে বিচরণ করিলেই মানুষের চলে না, যেহেতু বাস্তব জগতে বাস করা দরকার। কেবল কাল্পনিক সুখে সুখী হইয়াই মানুষ যদি সকল সময় নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করিতে পারিত এবং যদি আহার নিদ্রা বসন ভূষণ প্রভৃতির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে না হইত, তবে এক কথা ছিল বটে; কিন্তু তাহা যখন নয়, যখন মানুষকে সর্ব্বদাই টাকা আনা পাই এর হিসাব করিতে হয়, তখন লাভ লোকসানের হিসাব না করিলে চলিবে কেন? শুধু ভাবজগতে ভাসিয়া বেড়াইলে চলিবে কেন? ভাতের ভাবনা যে করিতে হয়? কাপড় যে পরিতে হয়? সে সব ভাবনাও যে করিতে হয়? সুতরাং লাভ লোক্সানের হিসাব না করিলে যে চলে না? সেদিক্ দিয়া দেখিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে না যাইয়া, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে' যাওয়া কিরূপে সম্ভবপর হয়? কিরূপে সময় এবং অর্থ ব্যয় করিয়া কেবলমাত্র ভাবের খাতিরে ওজনে কম জিনিষ লইতে পারি? লোকে তাহা পারে না, লয়ও না। এক্ষেত্রেও লইতে রাজি নয়? কেন রাজি হইবে? কি লাভের প্রত্যাশায়? সেখানেও শিক্ষা কেরাণীগিরী, এখানেও তাই; তবে লাভের আশা এই, যে সেখানে পড়িলে সম্মান সুবিধা

এবং কাজ কর্ম্ম পাইবার আশা থাকে, আর এখানে পড়িলে তাহাও থাকে না? তবে লোক এইখানে আসিবে কেন? আ'জ কা'ল "শুধু ভাবেতে ভুলে না মন, টাকা কড়ির প্রয়োজন।"

এ দুনিয়ায় জীবন যাপন করিতে হইলে টাকা কড়ির দরকার; কেবল ভাবে মগ্ন হইলে চলে না, তাই লোকে হয় না। ইহা অতি স্বাভাবিক এবং অতি সোজা কথা। ইহাতে দুর্‌ধিগম্য বা দোষের কথা কিছুই নাই।

যাহাই হউক, এই ত প্রকৃত অবস্থা। এখন কি করা যাইতে পারে? আমাদের উপযুক্ত হইবার একমাত্র উপায় বা পথ হইল উপযুক্ত ক্ষেত্র বা উপযুক্ত ইউনিভার্‌সিটি গঠন করা। আমাদের উদ্ধার হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। কারণ, এই পথই আমাদের পক্ষে সামান্যমাত্র সুগম বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু এই পথেরও অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তবে উপায় কি? কি উপায়ে পথ হইতে পারে? ইউনিভার্‌সিটির অবস্থা পরিবর্ত্তন করা কি সম্ভবপর? মৃতপ্রায় মুমূর্ষুকে পুনর্জীবন দান করা কি সম্ভব? নির্ব্বাপিত প্রায় প্রদীপটীকে পুনরুদ্দীপ্ত করা কি সম্ভব? গত প্রায় ইউনিভার্‌সিটি কি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যায়? আশা করিতে হইবে। কেন না, ইহাই একমাত্র অবলম্বন যোগ্য উপায়। ইহা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় বা পথ নাই। সুতরাং অবশ্য করিতে হইবে। এই গত প্রায় ইউনিভার্‌সিটিকেই পুনঃরায় সঞ্জীবিত করিতে হইবে। ইহা হইতেই আমাদের যাহা হয় করিতে হইবে।

"কিন্তু কিরূপে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্জীবিত হইতে পারে?"

ইহাই তাহা হইলে আমাদের একমাত্র ভাবিবার বিষয়। আমরা একবার এই ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হইয়াছি। এই অবস্থায় লোকে আর আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে কেন? কোন্ বিশ্বাসে ছেলেরা আবার এখানে অধ্যয়নার্থ আগমন করিবে? কি ভরসায় অভিভাবকগণ আবার এখানে তাঁহাদের ছেলেদিগকে প্রেরণ করিবেন? কি আশায়? কোন্ ভরসায়? কি বিশ্বাসে? সম্ভব কি? তবেই সম্ভব, তবেই ছাত্রগণ পুনরায় এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং তবেই অভিভাবকগণ আবার এখানে তাঁহাদের ছেলেদিগকে প্রেরণ করেন, যদি আমরা কিছু কাজ করিয়া দশের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে পারি। কথায় নয়, কাজ দ্বারা। আর সেদিন নাই, কেবল কথায় কাজ চলিবে না। এখন "কাজ দেখাইয়া কড়ি লইতে হইবে; শুধু কাজ দেখাইয়া—কথায় চিড়া ভিজিবে না।' কাজ দেখাইতে হইবে, কর্ম্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

কিন্তু ইউনিভার্সিটির এই শোচনীয় অবস্থায় কি কাজ দেখান সম্ভবপর হইতে পারে? এ অবস্থায় বর্ত্তমান ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃপক্ষগণ কি কাজ দেখাইতে পারেন?

এই প্রশ্ন সমুদয়ের উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষ বিলাতী কিংবা আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলি যেরূপ

মূলমন্ত্রে দীক্ষিত, এই ইউনিভারসিটি সেরূপ মূলমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? ইহার আদর্শ কলিকাতা ইউনিভারসিটি না হইয়া বিদেশী ইউনিভারসিটি হইতে পারে কি না? এবং অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের বিষয় সমূহ সেইরূপ ততদূর উন্নত করিতে পারেন কি না? অধ্যাপনার নিমিত্ত সেইরূপ সুশিক্ষিত অধ্যাপকমণ্ডলীর আমদানী করিতে পারেন কি না? আর অবশেষে বিজ্ঞান হাতে-কলমে শিখিবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন কি না? এক কথায় ইউনিভারসিটিকে ঠিক, বিলাতী বা আমেরিকার ইউনিভারসিটির ততখানি উচ্চ আদর্শে গঠন করিতে সাহসী হইতে পারেন কি না? যদি পারেন, তবে সবই হইতে পারে। আর যদি কর্ত্তৃকপক্ষ বলেন "না", তবে সকলই বৃথা—সবই পণ্ড পরিশ্রম। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাদের পক্ষে না বলাও মুস্কিল? কারণ ইউনিভারসিটি কর্ত্তৃপক্ষ একটী ইউনিভারসিটি তাহারা গঠন করিতে পারেন, এই বিশ্বাসেই অথবা চেষ্টা করিলে গড়িতে পারিবেন এইরূপ ধারণায় সাহস করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, এবং তাহারা এ বিষয়ে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। যাহাই হউক, ইউনিভারসিটি গঠন করিতে যে তাহারা সাহসী ছিলেন, এ সম্বন্ধে যে তাহারা কৃতসঙ্কল্প, এ কথা তাহাদের অস্বীকার করিবার যো নাই। অতএব গঠন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এখন যে একবারে অপ্রস্তুত এমনও নহে। যদি তাহাই না হ'ন, তবে অর্থ সামর্থ্য সমস্ত ব্যয় করিয়া যা' ইচ্ছা তা' একটা

গঠন করিবার কি দরকার? ঐরকম তো আছেই, তবে তাহা আবার কেন? যদি যাহা আছে কেবল তাহাই কর তবে আর সে তাহাই এ কি দরকার? যদি করিবেই, তবে ভাল করিয়া কর। যদি করিতেই হইবে, যখন কর্ত্তব্য নিশ্চয়, এবং যেহেতু আরম্ভ করিয়া ফেলিয়াছ, তখন বিলাতী কিংবা আমেরিকার ইউনিভার্সিটির আদর্শে কর। ততখানি উচ্চ এবং শিক্ষার এরূপ সুবন্দোবস্ত কর যে তথা হইতে পাশ করিয়া বাহির হইলে ছেলেদের মনে এরূপ একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে, যে তাহাদিগকে এই পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে ফেলিয়া রাখ, তাহারা সেখানেই তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে; যে তাহারা কখনও পরমুখাপেক্ষী হইবে না; যে তাহারা আপনাদের কার্য্যক্ষেত্র আপনারাই তৈয়ার করিয়া লইতে সাহসী ও প্রস্তুত; যে তাহারা নিজের উপর নির্ভর করিতে সর্ব্বদা নির্ভয় এবং তাহাতেই তাহারা সুখী; যে তাহারা গভর্ণমেণ্টের চাকরী না পাইলে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হয় না; যে তাহারা গভর্ণমেণ্টের চাকরীকে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারে। ইহাকে বলে ইউনিভারসিটি। দেশকে উন্নত করিতে হইলে এইরূপ ইউনিভারসিটিই দরকার। এই রকম ইউনিভারসিটিই উপযুক্ত লোক প্রসব করিয়া থাকে। ইহাকেই উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে। ইউনিভারসিটির অবস্থা এরূপ হইলে আর অধিক ডাকা-ডাকি করিতে হইবে না, আপন গরজেই ছাত্রসমুদয় আসিয়া জুটিতে থাকিবে, অভিভাবকগণও বেশী টাকা ব্যয় করিয়া

আপন ইচ্ছায় স্ব স্ব সন্তানগণকে এখানে আনিয়া রাখিয়া যাইবে।

এইরূপ ইউনিভারসিটি হওয়া চাই। কেন না, ইহাতে আমরা উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া উপযুক্ত হইতে পারিব। আর যেহেতু আমরা একবার সাহস করিয়া একটা কিছু আরম্ভ করিতে পারিয়াছি, যখন একটা কিছু করিবার মত কতকটা শক্তিও আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তখন আরও একটু সাহস বাড়াইয়া এবং আর একটু বেশী শক্তি সংগ্রহ করিয়া যাহাতে এইটা এমন একটা কিছু করা যাইতে পারে যদ্দ্বারা আমরা প্রকৃত পক্ষে উপকৃত এবং উন্নত হইতে পারি? ইহাই কি উচিত নয়? ইহাই কি কর্ত্তব্য নয়? ইহা কি সম্ভব নয়? ইহা কি আমরা পারিব না? অবশ্য সম্ভব। অবশ্য পারিব। যাহার কতক পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে, যাহার কতক পরিমাণে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার আর একটু পরিমাণ সম্পন্ন করা অবশ্য সম্ভব হইবে, অবশ্য পারিব। এখন সকলে একমন একপ্রাণ হইয়া যাহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহা করিতে পারিলেই হইল।

এদেশে সুসময়ের সমাগম।

আজ কাল দেখিতেছি এদেশে সুসময়ের সমাগম হইয়াছে। এদেশের ভাগ্যে আজ কাল এ একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের দিকে গভর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি পড়িয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সুধু তাই নয়, অনেক সময় গভর্ণমেণ্টের পোলিস-কর্ম্মচারীগণ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিচরণ করিতেন এবং এমন কি, আন্দোলনকারীদের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতেও ক্রটী করেন নাই। কিন্তু সে দিন ফুরাইয়াছে, সময় ফিরিয়াছে, আজ এদেশের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইয়াছে। হায় রে কাল!

বাজারের প্রায় সাড়ে পনর আনা পণ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। অন্মধ্যে প্রায় সাড়ে বার আনা অষ্ট্রো-জার্ম্মান। সম্প্রতি যুদ্ধের জন্য জার্ম্মান মাল এদেশে আসিতে পারিতেছে না, কাজে কাজেই সেই সমুদয় পণ্যদ্রব্যের বাজার ভয়ানক টান পরিয়াছে। এমন কি অল্পদিনের মধ্যে বাজারে এ সমুদয় পণ্যের সম্পূর্ণ অভাবের আশঙ্কা অনেকে না করিতেছেন এমনও নহে। সুতরাং যে পরিমাণ যাহা আছে, তাহারও দাম অপরিমিতরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক সময় অনেক অদূরদর্শী সওদাগর অল্প সময়ে কিছু করিয়া লইবার আশায়, সুবিধা বুঝিয়া প্রায় অসম্ভব রকমে দর বাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং সাধারণের অবস্থা দিন দিনই দৈন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট এ সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং প্রতিকারের চেষ্টা কতকটা না করিতেছেন তাহাও নহে। বিদেশী পণ্যের স্থান পূরণার্থে স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য প্রজাবর্গকে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। যে কারণেই হউক, এদেশের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা

নহে। যেরূপেই হউক, ইহা এদেশবাসীর পক্ষে সামান্য সুখের সংবাদ নহে।

গভর্ণমেণ্ট আপনা হইতে স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বসাধারণকে উৎসাহিত করিতেছেন, এদেশের ভাগে; এমন সময় এবং সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। অতিশয় সুখের কথা, বড় আনন্দের বিষয়। কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হইয়া কেবল সুখের স্বপন না দেখিয়া আলস্য পরিত্যাগ করত সুযোগের সুবিধা লইয়া যথাসম্ভব যত্ন করিয়া এই সময়ে যতটা যাহা করা যাইতে পারে তাহা করিয়া লওয়া উচিত। এই সময় অনেক অগ্রসর হওয়ার আশা করা যায়। অতএব যাহাতে এই সুযোগে আরও কতকগুলি কার্য্যক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। এবং গতপ্রায় পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত কলকারবারগুলিও যাহাতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া নূতন উদ্যমে কার্য্য করিতে পারে তদনুরূপ চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণ করিবার ইহা একটী সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া যাহাতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে না পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অকারণ আলস্যে আর সময় নষ্ট না করিয়া সময় যাহাতে আমাদের জন্য যথাসম্ভব সুফল প্রসব করিয়া রাখিয়া যায়, তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে এখন কর্ত্তব্য। এবং তাহা হইলে উপযুক্তক্ষেত্র হইতে উপদেশ ও হাতে কলমে শিখিয়া পড়িয়া অবশেষে এই সমুদয় কার্য্যক্ষেত্রে, কর্ম্ম করিয়া

বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবিধা হইবে। এবং ইহাই চাই।

শিক্ষিত পরিশ্রমী।

কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্ম সম্পাদনার্থে প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সামান্য কুলি পর্য্যন্ত সকলেরই শিক্ষিত হওয়া উচিত। সকলেরই অন্ততঃ পক্ষে সামান্য লেখা পড়া জানা নিতান্ত দরকার। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সভাপতি মিঃ এব্রাহিম লিঙ্কন এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "It is far better to have a few educated labourers than to have an uneducated lot." অর্থাৎ সামান্য কয়েকজন শিক্ষিত পরিশ্রমী, অশিক্ষিত অনেকগুলি অপেক্ষা অনেক ভাল। তাঁহার এই কথার গুরুত্ব যে অনেক, একথা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

শিক্ষিত পরিশ্রমী লইয়া কাজ করিতে অনেক সুবিধা। তাহাদের পেছনে গাধার মত খাটিতে হয় না। একবার অথবা জোর দুইবার বলিয়া দিলেই অনায়াসে বা অতি অল্পমাত্র আয়াসে নিজেদের কাজ বুঝিতে পারে। সুতরাং তাহাদিগকে এক কাজে নিযুক্ত করিয়া আদেশ রাখিয়া, নিজে অবাধে অন্যত্র যাওয়া যায় এবং তাহাতে অনেক বেশী কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। পরিশ্রমিগণ শিক্ষিত হইলে নিজেদের কাজ কর্ম্মের হিসাব নিজেরাই রাখিতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য হিসাবের সময় কোনও গোলমাল হয় না, এবং বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট করিতে হয় না। শিক্ষিত পরিশ্রমী লইয়া

কাজ কর্ম্ম করিতে এইরূপ সব বিষয়েই সুবিধা। তাই মিঃ লিঙ্কন বলিয়াছিলেন "It is far better to have a few educated labourers than to have an uneducated lot."

তারপর সাধারণ শিক্ষা যে সকল দেশে সকলেরই থাকা দরকার, অন্ততঃ লিখিতে পড়িতে জানা সে সকল শ্রেণীর লোকেরই নিতান্ত প্রয়োজন, এবিষয় আর কাহাকেও কারণ দেখাইয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, সভ্যজগৎ মাত্রেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিবে। কারণ, প্রায় সর্ব্বত্রই ইতঃপূর্ব্বেই ইহার অভাব কতদূর অনিষ্টকর এবং কতদূর অসুবিধাজনক তাহা বুঝিতে পারিয়া তদনুরূপ প্রতিবিধান করিয়াছে। কিন্তু কেবল এক ভারতবর্ষেই ইহার অভাব কতদূর অনিষ্টকর ও অসুবিধাজনক তাহা উপলব্ধি করিতে এত বিলম্ব, এবং প্রতিকারও এখন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই,—এখনও হইতে পারিতেছে না। যদিও বা শেষে ভারতমাতার একজনমাত্র সুসন্তান এই অভাবের অনিষ্ট-কারিতার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রতি-কারের প্রয়াসে দণ্ডায়মান হইতেছিলেন, তিনিও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ভারতমাতার কি দুর্ভাগ্যই বটে?

যা'ক্ এখন সে কথা, বৃথা আক্ষেপে আর কি ফলোদয় হইবে? কিন্তু কি উপায়ে সাধারণ-শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভবপর হইতে পারে? ইহা মোটেই সম্ভবপর কিনা?

আমরা মানুষ, অতএব অন্য মানুষে যাহা করিতে পারিয়াছে, আমরাও তাহা অবশ্য করিতে সক্ষম হইব ; তাহা করা আমাদের

পক্ষেও অবশ্য সম্ভবপর। সুতরাং অবশ্য করিব। কিন্তু কিরূপে কি করা সম্ভব? কিরূপে কি করিব?

অবশ্য "বাধ্যতামূলক শিক্ষা" নীতি অবলম্বনব্যতীত অল্প সময়ের মধ্যে এদেশে শিক্ষা বিস্তার করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের নিরক্ষরতা দূর করণার্থে মিঃ গোখ্‌লে গভর্ণমেণ্টকে এই নীতিই অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই। কি কারণ, তাহা কেহই বিশেষরূপে এ পর্য্যন্ত অবগত নহে; তবে মনে হয় গভর্ণমেণ্টের তহবিলে প্রচুর পরিমাণে অর্থ না থাকায়ই গভর্ণমেণ্ট এই নীতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ইহা ছাড়া অন্য কোনও কারণ যুক্তিতে আইসে না। কেননা, যদি অর্থের অভাব না হইত, তবে গভর্ণমেণ্ট তহবিলে টাকা জমা রাখিয়া, ইচ্ছা করিয়া কি ভারতে শিক্ষা বিস্তার কার্য্য বন্ধ রাখিয়াছেন?

'বাধ্যতামূলক শিক্ষা' নীতি অবলম্বনে অজস্র টাকার দরকার, দুই চা'র কোটী টাকায় কুলাইবে না। এ দুই চার কিংবা দশ কোটী টাকার কাজ নয়। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের তহবিলে এত টাকা বোধ হয় মজুত নাই—ভারত গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় কোনও উপায়েই এই টাকার যোগাড় দেখিতে পারিলেন না, তাই অনারেবল স্বর্গীয় মিঃ গোখ্‌লের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু এই অজস্র টাকা, এতবড় ভারতগভর্ণমেণ্ট যাহা যোগাড় হওয়ার সম্ভাবনা দেখিলেন না, দরিদ্র আমরা তাহা কিরূপে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইব? সম্ভব কি?

কেন নয়? আমরা মানুষ—ভারতবাসী আর্য্যসন্তান! দান আমাদের নিত্যকর্ম্ম, দান আমাদের আর্য্য ধর্ম্ম! এই অধঃপতিত অবস্থায়—আজও আমরা আত্ম-পর ও দেশ-বিদেশ নির্ব্বিশেষে অসংখ্য অসংখ্য কোটী কোটী টাকা দান করিতেছি। আর আজ আমাদের এই দেশের ভাবী মঙ্গলের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য দান করিতে পারিব না? আমরা প্রত্যেকে, যদি অতি অকিঞ্চিৎকর দানও করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হলেও দানার্থে প্রায় ত্রিশ কোটী হাত উত্তোলিত হইবে? অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় আমরা কেহই নই, কিন্তু একত্র আমরা ত্রিশ কোটী! একি কম? ত্রিশ কোটী—! কত টাকা দরকার—? কত টাকা লাগে—? কত টাকা চাই—? তারপর আবার, এটী ভারতবর্ষ? একবার মনে কর, একবার ভেবে দেখ, এটী সেই "ধন, ধান্য, পুষ্পে ভরা সাধের ভারত ভূমি"? কবিবর যথার্থই বড় সত্য গাথা গাহিয়াছেন—"সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি" এবং "এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।" প্রতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য!

এমনই দেশ আমাদের জন্মভূমি! এমনই দেশের অধিবাসী আমরা! আমাদের আবার অর্থাভাব? যদি যথার্থ আমরা কাজ করিতে প্রস্তুত হই, যদি বাস্তবিকই আমরা কাজ করি এবং যদি সত্য সত্যই আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া—স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করি, তবে আমাদের আবার টাকার অভাব? রত্ন-প্রসবিনী ভারতবর্ষে আবার টাকার অভাব?

"ধন, ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে একদেশ সকল দেশের সেরা,
ওযে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

ভারতবর্ষ রত্নপ্রসূ। এখানে ধন রত্নের অভাব নাই, সংগ্রাহকের অভাব। এই রত্নপ্রসূ ভারতবক্ষ হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে হইলে কতকগুলি একাগ্রচিত্ত অক্লান্ত পরিশ্রমক্ষম, অদম্য উত্তমশীল, এবং অসীম অধ্যবসায়সম্পন্ন সাধু প্রবৃত্তির কর্ম্ম-বীরের প্রয়োজন। কতকগুলি অমনোযোগী অর্দ্ধহৃদয়সম্পন্ন অসাধু অকর্ম্মা লোকের কর্ম্ম নয়। অর্দ্ধেকখানি হৃদয় লইয়া কেহ এত বড় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। অসাধু-চিত্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা কখনও এত বড় মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। একাজ করিতে সরল হৃদয়, সাধুপ্রবৃত্তি, সৎসাহসী, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের দরকার। কতকগুলি স্বার্থপর ছোট অন্তঃকণের লোকের কর্ম্ম নয়। রত্ন দিয়ে রত্ন কুড়াইতে হইবে। ধনবান্ পুরুষ সকল দিয়ে ধন সংগ্রহ করিতে হইবে, শক্তিশালী কর্ম্মবীরদিগের দ্বারা শক্তির আরাধনা করিতে হইবে। [illegible] দিয়ে কখনও ত্রৈলোক্যবিজয়ী হওয়া যায় না; অশক্ত, অধীর, অসাধু, অকর্ম্মা দ্বারা কোনও দিন এত বড়—এত মহৎ কর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারে না। কাজ করিতে হইলে উপযুক্ত কর্ম্মী চাই। যাহাদের প্রাণ-ভরা স্বদেশ-প্রেম, মনভরা স্বদেশ-ভক্তি এবং

হৃদয়ভরা সৎসাহস, এ তাহাদের কর্ম্ম, অন্যের নয়। অতএব চাই কর্ম্মী—সরল হৃদয় সাধু কর্ম্মবীর। তাই পাইলে এই সোনার ভারতে অজস্র অর্থ মিলিবে। এই ভারতবর্ষে সৎ কর্ম্মের জন্য কখনও কোনও দিন অর্থের অভাব হয় নাই, এং কর্ম্মের জন্যও হইবে না। কিন্তু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি অদম্য উদ্যমশীল, অটুট উৎসাহ পরিপূর্ণ হৃদয়, অক্লান্ত পরিশ্রমী, অসীম অধ্যবসায়সম্পন্ন, সাধু স্বদেশপ্রাণ কর্ম্মবীর চাই। এবং তাহা পাইলে, এদেশে—এই সোণার ভারতে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য কখনও অর্থের অভাব হইবে না। সুতরাং চাই এখন এই কর্ম্মী!

কিন্তু কিরূপে এই কর্ম্মিবৃন্দ সংগৃহীত হইতে পারে? তাহারা কোথায় আছে? কোথায় খুঁজিব? কিরূপে তাহাদের সন্ধান পাইব? কে বলিয়া দিবে? কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, কোথায় খুঁজিতে হইবে না, তাহারা আপনি আসিয়া জুটিবে। কর্ম্মই তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইবে, কেন না, কর্ম্মই জানে তাহারা কোথায় আছে। কারণ, কর্ম্মই কর্ম্মীর খোঁজ রাখিয়া থাকে। কর্ম্মীরা সততই কর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত দেখিলে কর্ম্মিগণ আপনি আসিয়া জুটিবে, কাহাকেও খুঁজিতে হইবে না। অতএব অগৌণে কর্ম্ম আরম্ভ করাই উচিত। কর্ম্মীর জন্য আটকাইবে না। কর্ম্মিবৃন্দ আপনিই আসিয়া জুটিবে, আপনি খুঁজিয়া লইবে। কর্ম্মই কর্ম্মী তৈয়ার করিয়া লইবে। অতএব কর্ম্মীর অনুসন্ধান করিয়া অধীর হইবার

দরকার নাই। সুতরাং যতশীঘ্র হয় কাজ আরম্ভ কর; কাজই কাজের লোকের যোগাড় করিবে।

সূচনা কর, তবে শেষ হইবে। সূচনা না করিলে শেষ হইবে কি করিয়া? সুতরাং যতশীঘ্র হয় সূচনা কর। কারণ যতশীঘ্র আরম্ভ করিবে, শেষও তত সত্বরই হইবে। তাই বলা হইতেছে, সত্বরই আরম্ভ কর।

সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার করা, এই এতবড় ভারতের নিরক্ষরতা দূর করা, এই ভারতবর্ষের চক্ষুদান করা, এই জন-সমাজকে উন্নতির পথে তুলিয়া দেওয়া, এই ভারতের অন্ধত্ব ও অধমত্ব দূর করিয়া উদ্ধারের পথে উঠাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য সামান্য কাজ নহে; অতি কঠিন, অতি উচ্চ এবং অতি মহৎ কার্য্য। ইহা সুসম্পন্ন করিতে অনেক সময়, অনেক সামর্থ্য এবং সাধনা দরকার। অনেক যোগাড় করিতে হইবে, অনেক কথা বলিতে হইবে এবং অনেক কাজ করিতে হইবে। অনেক দরকার, অনেক করিতে হইবে। তাই অতি সত্বর আরম্ভ করিতে বলিতেছি। আরম্ভ কর। উৎসাহিত হও. সাহসকে সঙ্গী কর, অদম্য উদ্যম হৃদয়ে ধারণ কর, সাহসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হও। কখনও ক্লান্ত বা হতাশ হইও না, অধৈর্য্য বা অধীর হইও না; সুস্থ, সুধীর ও প্রশান্ত হও, অসীম অধ্যবসায় তোমার সর্ব্বক্ষণ সহায় থাকুক, তুমি কর্ম্ম আরম্ভ কর। সর্ব্বকর্ম্ম-নিয়ন্তা কর্ম্মফল-কর্ত্তা ভগবান্ ইহা সুসম্পন্ন করুন।

ভগবান্ কাহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন ?

ভগবান্ কাহার সাহায্য করেন ?

কিন্তু ভগবান্ কাহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন ? যাহারা ইচ্ছা করে, বাসনা করে, তাহাদেরই ইচ্ছা বা বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পূর্ণ করিতে পারেন। বাসনা হইলে তবে তিনি বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। ইচ্ছা কিংবা বাসনা হইলে তবে তিনি পূর্ণ করিতে পারেন এবং করেন; কিন্তু ইচ্ছা না হইলে আর তিনি কি করিয়া কি পূর্ণ করিবেন ? কারণ ও কর্ম্ম হইলে তবে তাহার ফল ? নতুবা ফল আসিবে কোথা হইতে ? অতএব প্রথমে ইচ্ছা হওয়া দরকার, এবং তাহা ঐকান্তিকী হওয়া চাই। প্রাণের টান হওয়া চাই। প্রাণ কাঁদা চাই. প্রাণত্যাগী,—প্রাণ পরিচ্ছেদী হওয়া চাই, ইচ্ছা পূর্ণের প্রতিদানে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়া চাই। নইলে শুধু মুখের কথা ইচ্ছায় ইচ্ছাপূর্ণ হইতে পারে না, কখনও হয় না। ইচ্ছা বা বাসনা পূর্ণের জন্য অদম্য উদ্যম চাই, অক্লান্ত চেষ্টা চাই, অসাধারণ অধ্যবসায় চাই, তবে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। যাঁহারা প্রাণ দিয়া ইচ্ছাপূর্ণ জন্য চেষ্টা করেন, যাঁহারা প্রাণ বিনিময়েও আশা পূর্ণের আকাঙ্ক্ষা ও যত্ন করেন, ভগবান্ তাঁহাদেরই ইচ্ছা পূর্ণ করেন, বাঞ্ছা-পূর্ণকারী হরি তাঁহাদেরই বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আর ভগবান্ তাঁহাদেরই সাহায্য করেন, যাঁহারা আপনাদিগের সাহায্য আপনারা

করিতে চেষ্টা করেন। তাহা না হইলে কেবল আশা করিলেই যদি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া যাইত—পার্থিব রত্ন হাতে মিলিত আর আকাশের চাঁদ আয়ত্তাধীনে আসিতে পারিত, যদি কাজ না করিয়া শুধু দুইবেলা কালীমন্দিরের সম্মুখে মাথা ঠুকিলেই কার্য্য উদ্ধার হইতে পারিত, অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারিত কিংবা ঈপ্সিত আয়ত্তাধীন হইতে পারিত, তবে আর ভাবনা ছিল কি? তাহা হইলে কোন কাজ কর্ম্ম না করিয়া কেবল দুবেলা কালীমন্দিরে গেলেই চলিতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে, কাঞ্চন পাইতে হইলে কার্য্য করা চাই, অভীষ্ট লাভের জন্য আশানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইবে এবং আপনি কাজ করিলে তবে কাজে ভগবানের সহায়তা লাভ করা যাইবে, ভগবান্ সাহায্য করিবেন। কর্ম্ম বিনা কখনও কামনা পূর্ণ হইতে পারে না, কার্য্য বিনা কৃষ্ণ লাভ হয় না। অতএব কামনার সঙ্গে সঙ্গে কামনাপূর্ণোপযোগী কর্ম্ম সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে। চাই ইচ্ছা এবং ইচ্ছানুরূপ অভীষ্ট লাভের চেষ্টা, তবে ত ভগবান্ সাহায্য করিবেন এবং ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।

তাহা হইলে বর্ত্তমানে আমাদের কি কর্ত্তব্য ?

আমরা অশিক্ষিত, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, চোখ থাকিতেও দেখিতে পায় না, কাণ থাকিতেও শুনিতে পায় না, দুনিয়ার খবর রাখা তাহাদের পক্ষে হইয়া উঠে না, সম্ভবপর হয় না, তাহারা মূর্খ। যদি আমরা শিক্ষিত হইয়া থাকি—যদি

শিক্ষিত বলিয়া কথিত হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকি, যদি আমরা শিক্ষিত নামের কলঙ্ক না হই, তবে আমাদের কর্ত্তব্য, আমরাও যেমন দুই-চার অক্ষর লেখা পড়া শিখিয়াছি, যেমন আমরাও লিখিতে পড়িতে এবং বলিতে পারি, যেমন আমরা দুনিয়ার খবর রাখিতে সক্ষম, 'তাহাদিগকে'ও অন্ততঃ সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া নিজের হিসাব পত্র রাখিবার মত উপযুক্ত করিয়া দেওয়া। আমাদের ইহা কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্য পালনে ঐকান্তিকী ইচ্ছা হওয়া নিতান্ত উচিত। যদি তাহা না হয়, তবে আমরা শিক্ষিত নামের কলঙ্ক মাত্র। আশা করি, এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ এ কলঙ্ক ক্রয় করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। ভরসা করি, তাঁহারা সকলেই, অশিক্ষিতের কি অভাবনীয় অসুবিধা তাহা অনায়াসে অনুধাবন করিতে পারেন। অতএব তাঁহারা সকলেই যে শিক্ষা বিস্তারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ইহা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়াও বলিতে পারি এবং বলিতেছি। আমরা শিক্ষা বিস্তার চাই, আমাদের একান্ত ইচ্ছা আমাদের দেশীয় লোকের নিরক্ষরতা দূর হ'ক। আমাদের ইচ্ছা আমাদের দেশের সর্ব্ব-সাধারণ—স্ত্রী পুরুষ সকলে, লিখিতে পড়িতে শিখুক। এই ইচ্ছায় আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি কাহারও অনিচ্ছা নাই, থাকিতে পারে না।

কিন্তু শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে—এতদ্দেশীয় জনসাধারণের নিরক্ষরতা বিদুরিত করিতে হইলে অতি প্রথমে আমাদিগকে প্রচারকের কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমেই সর্ব্বসাধারণকে

বুঝাইতে হইবে তাহাদের লেখা পড়া শিখা দরকার এবং এই প্রচারকার্য্য সম্পাদন করিতে স্বর্গগত প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথই প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। কতকগুলি নিঃস্বার্থ-চিত্ত যুবক যদি শিক্ষাপ্রদ সামগ্রী লইয়া দেশের সমস্ত সহরে সহরে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, পরিভ্রমণপূর্ব্বক শিক্ষণীয় বিষয়গুলি দেখাইয়া শিখাইয়া বুঝাইয়া বলিয়া শিক্ষালাভের জন্য জনসাধারণের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে শিক্ষা বিস্তার ব্যাপারটা একটু সোজা হইয়া পড়ে।

তার পর সাহিত্য-সেবিগণ ও সাহিত্য-প্রকাশকগণ শিক্ষা বিস্তারে আমাদের আরও একটু সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা যদি বৈজ্ঞানিক, শিল্প-সম্বন্ধীয়, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ও ইতিহাস, সাহিত্য, এবং কৃষি সম্বন্ধীয় এমন কতকগুলি বিষয় লইয়া অতি সাধারণ —সোজা ভাষায় এমন কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন, যাহা সর্ব্বসাধারণে অতি সহজে বুঝিতে পারে, এবং তাহাতে যে যে বিষয় লিখিত হইবে তদ্দ্বারা তাহারা প্রত্যেকে দৈনন্দিন জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যাপারে অন্ততঃ সামান্য কিছুও উপদেশ পায় ও উপকারিতা অনুভব করিতে পারে, মানে যাহা তাহাদের বর্ত্তমানে হাতের কাজে হাতে-কলমে, আজই উপকারে আসে, তাহা হইলে শিক্ষা বিস্তারের দিকে বিশেষ সহায়তা করা হয়। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি তাঁহারা যদি এরূপ ভাবে এমন সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন যে, সর্ব্বসাধরণেই অতি সহজে বুঝিতে পারে এবং তাহা হইতে তাহাদের দরকার

অনুযায়ী যতটুক সম্ভব উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং ঐ সমুদয় বিষয়ে আরো বেশী জানিবার জন্য উৎসুক হয়, তাহা হইলে তাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দেন।

আমাদের দেশে প্রায় সকলই আছে, এদেশে প্রায় কিছুরই অভাব নাই, প্রত্যেকটী জাতি এক একটী বিষয় ধরিয়া আছে। এদেশে জাতিভেদের ইতিহাসখানির পাতা উল্টাইয়া দেখিলে দেখা যায়, যে কর্ম্মবিভাগই জাতিবিভাগের মূল কারণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মালী, তিলি, কর্ম্মকার পর্য্যন্ত যত সব জাতি এই দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী কর্ম্মবিভাগের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। ইহারা বংশানুক্রমে একই কার্য্য—একই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া আসাতে অবশেষে সেই ব্যবসায়ের নামে তাহার জাতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই সমুদয় জাতির ব্যবসায় সমুদয় বংশানুক্রমিক এবং ব্যবসায় নামানুযায়ী তাহারা কথিত। তাহা ছাড়া তথা কথিত কতকগুলি পুরাণ উক্ত প্রকারে কেহই ব্রহ্মা কিংবা বিষ্ণুর বদন, বাহু কিম্বা উরু প্রভৃতি দেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। সে সব রচনা শেষে কেবল দর্শনের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করিতে হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আসল কথা ঐ কর্ম্মের হিসাবে জাতির সৃষ্টি।

এই সকল জাতি আবহমান কাল হইতে আপনাদের স্ব স্ব ব্যবসা ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং যে জাতির যে ব্যবসা, সেই জাতির লোকেরা সেই সেই ব্যবসায়, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কম আর বেশী, অধিকার আছে। যদি সাহিত্যিকগণ অতি সরল

ভাষায় সোজা করিয়া ঐ সব ব্যবসায় ব্যবসায়ীগণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী কিরূপে অন্ততঃ সামান্য সাহায্য পাইতে পারে তাহা দেখাইয়া কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং প্রকাশকগণ ঐ সমুদয় পুস্তকাবলী প্রকাশ করিয়া সহর হইতে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত প্রচারিত করিতে পারেন—তাহা হইলে শিক্ষা বিস্তারের অনেক সুবিধা হইতে পারে। কারণ, যাহার যে ব্যবসায় এই সমুদয় পুস্তক হইতে যতটুক সাহায্য পাইবে তাহার ততই নিজের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সেই সমুদায় বিষয় আরো পাঠ করিবার ইচ্ছা জন্মিবে; এবং যত পড়িবে ততই সেই সমুদায় বিষয়ের পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায় উন্নতির জন্য জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। সুতরাং বলি সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকে একটু ফিরাইলে বিশেষ উপকার হয়। তাঁহারা যদি সাধারণের নিকট অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের পুস্তকাদি প্রেরণ না করিয়া তাহাদের কাজের কথা লইয়া তাহাদের নিকট গমন করেন, তবে তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য সাধারণে অধিক ব্যগ্র হইবে এবং অধিক উৎসাহ জানাইবে।

বিষয়টা এই যে, যাহারা দৈনিক খোরাকির জন্য দিন দিন ঘানি ঘুরাইতেছে তাহাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের অমূল্যবাণী অথবা অতুলনীয় উদাহরণ বড় বেশী সাদরে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, তখন তাহার পেটে ক্ষুধা। আধ্যাত্মিক জগতের উপদেশ শুনিয়া তখন তাহার পেট ভরিবে না, কাজে কাজেই সে সমুদায় উপদেশ তখন তাহার নিকট সম্মান পাইবে না। কেন না,

তখন তাহার ঘানি ঘুরাইতে হইবে এবং তাহা হইতে উৎপন্ন তৈল বিক্রয় করিয়া যে পয়সা হইবে, তদ্দ্বারা তাহার পেটের জ্বালা দূর হইবে; সুতরাং তাহাই তাহার প্রথমে ভাবনার বিষয় এবং তাহাতে যদি কেহ তখন তাহাকে কোনরূপ উপদেশ দিতে পারেন, তাহা তাহার নিকট অতি আদরে গৃহীত হইবে, দর্শন তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

গোয়ালা আজন্ম দুগ্ধের ব্যবসা করিয়া আসিতেছে। দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয় করত যে পয়সা পাইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। অন্য কোন বিষয়ের পূর্ব্বে তাহার সেই বিষয়টী চাই। কোন সাহিত্যিক যদি বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা গোয়ালাকে কিসে তাহার সেই ব্যবসায় একটু বেশী লাভবান্ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন, কিসে সে তাহার ব্যবসায়ে আরো উন্নতি করিতে পারে, দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে সে তাহাকে অধিকতর যত্ন করিবে এবং তাহার কথা অধিকতর যত্নের সহিত শুনিতে প্রয়াস পাইবে ও তাহার প্রণীত ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে রচিত পুস্তকাবলী পাঠ করিতে অধিক উৎসুক হইবে। ঐতিহাসিকের ইতিহাস তাহার নিকট বড় বেশী আদর পাইবে না। তেমনি কামার, কুমার, তাঁতি তাহাদের স্ব স্ব ব্যবসা সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু বলিতে পারেন, যদি এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাহাদিগকে শিখাইতে পারেন যে, যদ্দ্বারা তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ে অধিকতর লাভবান্ হইতে পারে, শীঘ্র সাংসারিক উন্নতি করিতে সমর্থ হয়, তবে তাঁহারই

কথা তাহারা আগে শুনিবে, তাঁহারই প্রণীত পুস্তক তাহারা যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে এবং সেই সমুদয় পুস্তক পাঠের জন্য তাহারা অধিকতর উৎসুক হইবে; সাহিত্যের সমালোচনা পাঠ করিতে তখন তাহারা চাহিবে না। এইরূপ সকলের সম্বন্ধেই।

কথাটা কি—পেটের চিন্তা সকলের পূর্ব্বে, তাহার পরে আর যাহা কিছু হয় ভাল, না হয় দোষ নাই। বর্ত্তমান জগতে যাহাতে পেট ভরে, তাহাই সকলের পূর্ব্বে চাই। আজ কাল টাকা, আনা, পয়সার হিসাবটাই অধিক,—আর তাহা না হইলেও নয়। প্রথমে খাইয়া বাঁচিতে হইবে, তাহার পরে অন্য কথা। এইরূপ সকলের পক্ষেই—সকল জাতীর পক্ষেই। যাহার যাহা দরকার তাহার সম্মুখে যদি তাহাই ধরা যায়, তবে তাহা সে সাদরে গ্রহণ করে, আর যাহা দরকার নয়, তাহা বড় একটা কেহ চাহে না। এদেশী লোকদিগের এখন যে সমুদয় যাহা কিছু দরকার, সেই সমুদয় যদি এখন তাহাদের সম্মুখে ধরা যায়, তবে তাহা অবশ্য আদর পাইবে। এখন দেশী লোকের পেটে ক্ষুধা, তাহারা পয়সা চায়। যাহাতে তাহাদের দু'টী পয়সা হয়, যাহাতে তাহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ে অধিক লাভবান্ হইতে পারে, তাহা বলিতে পারিলে তাহারা অবশ্যই শুনিবে ইহা অতি স্বাভাবিক। যে সব পুস্তকে সেই সমুদয় বিষয় লিখিত হইবে, সে সব পুস্তক, তাহারা নিজে পড়িতে না জানিলেও, অন্য লোক দ্বারা পাঠ করাইয়া বিষয়টী অবগত হইতে অভিলাষী হইবে। এবং তদ্দ্বারা যদি তাহার কিছু উপকার হয়, তবে সেই বিষয়ে তাহার জ্ঞান-পিপাসা বাড়িয়া যাইবে এবং

পাঠকের অভাব দূর করণের জন্য নিজে লেখা পড়া শিখিতে প্রয়াস পাইবে, নতুবা ছেলে যদি থাকে, তবে তাহাকে লেখা পড়া শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ব্যগ্র হইবে। সুতরাং বৈষয়িক বিষয় লইয়া যাহার যেরূপ ক্ষমতা, যিনি যে বিষয়ে অধিক পারদর্শী, তিনি সেই বিষয়ের নানা প্রকার চিত্রাদি সহ পুস্তক প্রণয়ন করিলে এবং উৎসাহী প্রকাশকগণ সেই সমুদয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রেরণ করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই উভয়েই অধিক লাভবান্ হইবেন এবং অন্যদিকে শিক্ষা বিস্তারের পথটী আস্তে আস্তে সুগম হইয়া আসিবে। ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশসমূহে শিক্ষিত সমাজের শিল্প-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ যাঁহার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তিনি তদ্দ্বারা এইরূপে দেশীয় অন্য লোকদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন এবং এই কারণেই ঐ সমুদয় দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত, উন্নত এবং সুখী।

শিক্ষিতদিগের কর্ত্তব্যই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে তাহাদের উপকার, উন্নতি ও মঙ্গল হয়, তাহা করা। ইউরোপ কিংবা আমেরিকার শিক্ষিত সম্প্রদায় সেইরূপ করিয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারাই তাঁহাদের যাহা কিছু রোজগার এবং তাহা যে নেহাত কম তাহাও নহে। এদেশী ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটগণ কেবলই চাকরী পাইবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া যদি একটু পরিশ্রম করিয়া এই দিকটা গড়িয়া তুলিতে পারেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। কেমিষ্ট্রি পড়িয়া কেরাণীগিরি করিতে না যাইয়া যদি এই দিকে কিছু করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বোধ

হয় অধিক লাভবান্ হইতে পারেন এবং তাহাতে দেশেরও অনেক কাজ করা হয়। এইরূপ যিনি বটানী পড়িয়াছেন তিনি যদি গাছ গাছড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকিয়া যাহাতে তাহারা যাহারা নানারূপ ফলের বাগান করেন, এবং সারবান্ বৃক্ষের ব্যবসা করেন অথবা যাহারা আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী তাহাদের সাহায্য করিতে পারেন, অথচ যাহাতে তাহাদের নিজেদেরও যথেষ্ট আয় হয়, তিনি তাহা করিতে পারিলে ভাল হয়। এইরূপ সমুদয় চেষ্টায় কতকগুলি নূতন রকমের কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। ইহাতে দেশীয় অনেকগুলি লোকের অন্নের সংস্থান হয়, বহু লোক প্রাণ পায়। তাই বলি, বৃথা 'বার'কে আর অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত না করিয়া গবর্ণমেণ্ট, মার্চেণ্ট এবং খবরের কাগজের অফিস আর্জির তাড়ায় আর ভারী না করিয়া এই সমুদয় বিষয় চেষ্টা করিলে কি ভাল হয় না? একটু সাহস করিয়া আরম্ভ করিলেই তো হয়। আর যদি তাহাই না করিবে তবে ওবিষয়ে যাইবারই বা দরকার ছিল কি? পারিব না, হইবে না—বলিয়াই কি ভয়ে পথ পরিত্যাগ করিবে? যাও না, চল না? পথে কি বাঘ, ভল্লুক, না—সিংহ আছে? তবে ভীত হইতেছ কেন? যাও, অগ্রসর হও। কোনও ভয় নাই, কারবার আরম্ভ কর, অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। আর, না পার, ফেল হইবে। কিন্তু তাহাতে এত ভীত হইতেছ কেন? কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পূর্ব্বে না হয় ২।১ বার কিংবা দুইচারিবার ফেল পড়িবে এবং তজ্জন্য না হয় ২।৪ জন অনভিজ্ঞ লোক তোমাদিগকে দুই

চার কথা বলিবে। তাহাতে ভয় কি? যাহারা কারবার করে, তাহারাই ফেল পড়িয়া থাকে, এবং আবার চেষ্টা করে, কিন্তু কারবার আরম্ভ করিবার আগেই ভয়ে পথ ছাড়িয়া দেয় কে? যাও, আরম্ভ কর। আরম্ভ না করিলে শেষ হইবে কি করিয়া? তাই বলি যাও, আরম্ভ কর; ফেল হও, আবার কর,—আবার চেষ্টা কর; অবশেষে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। তাই বলি, যাও, ভীত হইবার কি রহিয়াছে? ভয়ে পথ ছাড়িয়া পলাইবে কেন? ছি! তোমরা আবার মানুষ? তোমরা আবার শিক্ষিত? যদি এমনই হইবে, তবে আর এ শিক্ষালাভে দরকার ছিল কি? শিখিয়া লাভ হইল কি? শিক্ষায় মনকে সম্প্রসারিত ও সাহসী করিয়া দেয়, কিন্তু এ শিক্ষা লাভে যদি মন সঙ্কুচিতই হইয়া থাকে তবে আর এমন শিক্ষা পেয়ে দরকার ছিল কি? শিক্ষায় যদি সাহস না দেয়, আর তৎপরিবর্ত্তে অঞ্চলের আঁড়ালে পলাইতে শিখায়, তবে আর তেমন শিক্ষার দরকার কি? ওরূপ শিক্ষা না পাইলে কি নয়? যদি কেহ সেরূপ শিক্ষা পেয়ে থাক, তবে তাহা ভুলিয়া যাও, মূর্খ হও, গোঁয়াড়-গোবিন্দ সাজ, ভাল মন্দ না ভাবিয়া কাজ আরম্ভ কর, দেখিবে বেশ উত্‌রে যাবে। সত্বর আরম্ভ কর। আরম্ভে অন্ত নিহিত রহিয়াছে। ভীত হইও না—আরম্ভ কর, ...পন্ন হইবে।

যাহাই হোক, এই প্রকারে সাহিত্যিক, বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ও প্রকাশকগণ এবং নিঃস্বার্থচিত্ত যুবক প্রচারকগণ শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করিয়া দিতে পারেন।

আর একটী বিষয় একইরূপ এই পথে সহায়তা করিতে সক্ষম। এটী আর কিছুই নয়, কতকগুলি শিক্ষাগার সংস্থাপন করা। মানে, স্থানে স্থানে কতকগুলি লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার খোলা। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজও আমরা এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহিয়াছি। আমাদের সময়ের মা-বাপ নাই কি না! ইউরোপীয় দেশে অথবা আমেরিকায় যদি কেহ কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যায়, আর যদি, কোন কারণে দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ অভ্যাগতকে হয় একখানা দৈনিক কাগজ আর না হয় আলমারী খুলিয়া একখানি বই বাহির করত তাহাকে পড়িতে দেয়। দুই এক মিনিট সময়ও বৃথা কাটান হইবে না। প্রত্যেকের সময়ের মূল্য এত অধিক। যখন যতটুকু সময় পায় সেই সময়টুকু অপব্যয় না করিয়া পাঠে সদ্ব্যয় করে। প্রত্যেকের ঘরে, ছোট-খাট একটী করিয়া লাইব্রেরী আছে, সময় পাইলেই সৎসঙ্গে সময়টুকু কাটায়। আর আমরা? মিনিট ত ভাল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পর্য্যন্ত অবাধে অলস ভাবে বসিয়া কাটাইতে পারি, তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিরক্তি বোধ করিব না! আর ঘরে ঘরে লাইব্রেরী হওয়া ত দূরের কথা, আমাদের এই কলিকাতার মত মহানগরীতেও আজ পর্য্যন্ত একটী সেরকম জনসাধারণের জন্য লাইব্রেরী হইতে পারে নাই। যে কয়েকটী আছে তাহা যেন তাহাদের স্বকীয় সম্পত্তি। সাধারণের সেখানে যাওয়া অসম্ভব। এটী বড় দুঃখের কথা! একেত লোক পড়িতেই চায় না, তার

পর আবার যাহারাও পড়িতে চায় তাহারাও পাঠের স্থযোগ ও স্থবিধা না থাকায় অবসর সময় অগত্যা চা'র দোকানে বসিয়া প্রায় বৃথা গল্পগুজবে কাল কাটাইতে বাধ্য হয়। কি করিবে? যায় কোথায়? করে কি? এমন একটী যায়গা নাই যেখানে যাইয়া দু'দণ্ড বসিতে পারে, দুই একটী বিষয় যাহা তাহাদের জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা জানিতে পারে অথবা যদি একখানা বই পড়িতে হয় তবে পড়িতেপারে। কলিকাতার পক্ষে ইহা বড় একটা অভাব, আর কলিকাতার অধিবাসীদিগের পক্ষে ইহা বড় একটী লজ্জার কথা! আরও দুঃখের বিষয় এই যে, দুই একজনের নিকট এই বিষয় বলিলে তাহারা আবার বড় মুখে বলিয়া থাকেন "কেন, আছে ত! অতবড় মেট্কাফ্ হল রহিয়াছে—আবার চাই কি?', কিন্তু ক'জনে ক'দিন সেখানে যাইয়া থাকে? যাও না—কোন দিনও যাও না। কিন্তু যদি গোলদীঘির ধারে অথবা এরূপ কোন মধ্যবর্ত্তী যায়গায় তেমন একটী লাইব্রেরী থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই যাইতে—অনেকেই আসিত। যাহারা কখনও কোন দিন পড়াশুনা করে না, এখানে তেমন একটী লাইব্রেরী থাকিলে তাহারাও তথায় যাইয়া দুই একবার বসিত এবং দুই একখানা বইও পড়িত। মেট্কাফ্ হল আছে—যায়গাটীও নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু তুমি আমি পয়সা ব্যয় করিয়া প্রত্যেক দিন তথায় যাইতে পারি কি? আর, তারপরে আর একটী কথা,—যাইব কখন? দশটা হইতে পাঁচটা অফিসের সময়, তখন প্রায় সকলেই অফিসে যাইয়া থাকে। তখন পেটের জন্য কাজ করে। সেটা লাইব্রেরীতে

যাইবার সময় নয়। তার পরে পাঁচটার পর অফিস হইতে বাহির হইলে, তখন অফিসারদিগের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় আর তখন তাহাদের লাইব্রেরীতে যাইয়া পড়াশুনা করিবার সময় নয়,—তখন বিশ্রাম এবং পুনরায় শক্তিসংগ্রহ করা দরকার। সুতরাং লোকে তাহাই করিয়া থাকে। তারপর বিশ্রামাদি করিয়া যখন কিছু পাইলে দু'চার পাতা পড়িতে পারে এবং দু'দণ্ড বিশ্রাম করিতে করিতেও সময়টুকুর সদ্ব্যয় করিতে পারে, তখন লাইব্রেরী বন্ধ হইয়া যায়। আর সকাল বেলায় ত দশটার আগে খোলাই হইবে না। তবে আর সে লাইব্রেরী থাকায় লাভ কি, আর না থাকাতেই বা লোকসান কি? কিন্তু যদি মধ্যবর্ত্তী স্থানে তেমন কোন একটী লাইব্রেরী থাকে যেখানে সকলেই সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত যখন ইচ্ছা যাইয়া দু' দণ্ড বসিতে পারে এবং দু' চার'খানা বই দেখিতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই চা'র দোকানে যাইয়া, বৃথা বাক্যালাপে কাল না কাটাইয়া, সে সময়টুকু লাইব্রেরীতে যাইয়া সদ্ব্যবহার করে। কলিকাতার সর্ব্বসাধারণের জন্য, কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী স্থানে সেরূপ একটী লাইব্রেরীর যে দরকার তাহাতে আর কোন ভুল নাই। যদিও এখন দেখা যায় যে, লাইব্রেরীতে যাইয়া পড়ুয়ার সংখ্যা অতিশয় কম, তথাপি আমি বলিতে পারি সেরূপ একটী লাইব্রেরী হইলে অনেকেই পড়িতে শিখিবে, পড়ুয়া হইবে এবং প্রতিদিনই পড়িতে যাইবে। কলিকাতায় যাহাতে এইরূপ একটী

সর্ব্বসাধারণের পড়িবার স্থান হয়, কলিকাতার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত উচিত এবং কলিকাতাবাসীদের তাহাদিগকে এইকার্য্যে যতদূর সম্ভব সাহায্য করা উচিত।

শিক্ষাবিস্তার কল্পেও ঐপ্রকার স্থানে স্থানে কতকগুলি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যাদি লইয়া যাহাতে এইরূপ এক একটী লাইব্রেরী স্থাপিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা নিতান্ত উচিত। কেন না, এ সমুদয় হইলেই ঐ সমুদয় স্থানের জনসমূহের পড়াশুনার দিকে মন যাইবে এবং আস্তে আস্তে তাহাদের পড়াশুনা করিবার উৎসাহ হইবে এবং তদ্দৃষ্টে আপামরসাধারণেরও পড়িবার জন্য একটা উৎসাহ জন্মিবার নিতান্ত সম্ভাবনা, এবং তাহা হইলেই শিক্ষা বিস্তারের পথ অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং কতকগুলি পুস্তকালয় সংস্থাপন করা আমাদের নিতান্ত দরকার। ভবিষ্যতে বাঙ্গালায়ও যাহাতে প্রতি ঘরে ঘরে এক একটী করিয়া লাইব্রেরী হইতে পারে, তাহার জন্য শিক্ষিত জনমাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে সাহিত্যিক এবং তাহাদের পুস্তকাদির প্রকাশকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ নিতান্ত দরকার। কিন্তু সাহিত্যিকগণের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে তাহারা যাহা লিখিবেন তাহা ভাষার দিক্ দিয়া যত দূর হ'ক আর নাই হো'ক, কিন্তু ভাবের দিকে যেন খুবই প্রবল হয়। ভাষার প্রাণ ভাব, ভাব না থাকিলে ভাষা প্রাণহীন। তাঁহাদের ভাষায় যদি ভাব না থাকে, তবে শুধু প্রাণশূন্য ভাষা জনমণ্ডলীর প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিবে না। আর যদি তাহাই করিতে

না পারে, যদি ভাষা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারে, তবে তাহাদের লেখা—তাঁহাদের পুস্তক-প্রণয়ন এ সমস্তই বৃথা পরিশ্রম হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহাদের এই প্রাণশূন্য ভাষা দ্বারা তাহারা কাহারও কোন উপকার করিতে পারিবেন না, কেহই তাঁহাদের এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবে না। আর তাঁ'রা নিজেরাও তাঁহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিতোষিক পাইতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা যাহা লিখিবেন তাহা জনসাধারণের উপকারে আসা চাই। সুতরাং তাঁহারা যে বিষয় ভাল জানেন, যে বিষয়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা অধিক, আর যে বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের একটা স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ আছে, সেই বিষয় লইয়া সেই বিষয়ে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়া যাহাতে জনসাধারণের উপকার করিতে সক্ষম হ'ন তাহাই করিবেন। মোট কথা, তাঁহাদের লেখা প্রাণশূন্য হইলে চলিবে না, প্রাণ পূর্ণ হওয়া চাই। যাহা লিখিবেন তাহা দশের উপকারে আসা চাই। যদি তাহা করিতে পারেন তাহা হইলে শিক্ষা বিস্তারের পথ তাঁহারা অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিতে পারিবেন। আসল কথাটা এই যে, দেশের ভিতর শিক্ষা লাভের জন্য একটা ঐকান্তিকী ইচ্ছা জাগাইয়া তোলা। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়, সকলেই লেখা পড়া শিখিতে চায়, সকলেই জ্ঞানলাভের জন্য ব্যস্ত হয়, ইহাই দরকার এবং তজ্জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য বিবেচিত হয় তৎসমস্তই করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই শিক্ষা বিস্তারের প্রথম সিঁড়ি অতিক্রম করা হইল।

আমাদের দেশে অনেক জমিদার আছেন। অনেকেরই দু'এক লাখ টাকা আয়ের জমিদারী আছে। তাঁহাদের অনেকেরই শিক্ষায় সে রূপ সহানুভূতি দেখা যায় না, তাঁহারা যেন এ সম্বন্ধে কি এক রকম হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে যেন এ সব বিষয়ে বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বড়ই দুঃখের বিষয় বটে! দেশে কত শিক্ষিত লোক সামান্য সহানুভূতির অভাবে কত কষ্ট ভোগ করিতেছে, মহামূল্য জীবনগুলি বৃথায় যাইতেছে, মহামূল্য সময় তাহাদের অযথা অতিবাহিত হইতেছে। তাহারা কোথায়ও কণা মাত্র সাহায্য কিংবা সহানুভূতি পাইতেছে না। তাহারা যেন কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই জন্মিয়াছে এবং তাহাই করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এমন লোক অনেক আছে যাহারা সামান্য মাত্র সহানুভূতি পাইলে অনেক কাজ. করিতে পারে, সমাজের অনেক হিতসাধন করিতে পারে, কিন্তু হায়, সামান্য মাত্র সহানুভূতির অভাবে অমূল্য জীবন, দুর্মূল্য সময় সব শুধু বৃথায় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কে তাহার জন্য ভ্রূক্ষেপ করে, কে তাহাদের জন্য আক্ষেপ করে, কে তাহাদের অশ্রুবিন্দু পর্য্যন্ত দিয়া সান্ত্বন দেয়, কে তাহাদের প্রস্তাব সমর্থন করে, আর কেই বা তাহাদিগকে সামান্য মাত্র আশ্রয় দিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া তুলে? হায়, তাঁহারা যেন শুধু কষ্ট ভোগ করিতেই আসিয়াছেন এবং তাহাই তাদের কর্ম্ম! আর তাহাদের এই কষ্ট ভোগ করারই দৃশ্য এই ভারতভূমির শিক্ষা! এই সমুদয় শিক্ষিত মানব রত্নগুলি কেবলই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কেবলই ক্লান্ত হইতেছে, আর প্রকৃতির প্রিয়পুত্রগণ

মায়ের কোলে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন! কি সুন্দর দৃশ্যই বটে! কিন্তু খুবই সাধারণ। বৈমাত্রেয় ভ্রাতায় এইভাব নিতান্ত অসঙ্গত ভাব নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এভাবে ভারতমাতার দুঃখ ঘুচে কৈ? ভারতমাতার গতি কি? লক্ষ্মী আর সরস্বতী এ দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ না করিলে, এ দুই জন হাত ধরাধরি করিয়া মায়ের দুই দিকে না দাঁড়াইলে, দুই বোনে মিত্রতা না করিলে, ভারত-মাতার যে আর গতি হয় না! এদেশীয় ধনবান জমিদারগণ যদি দরিদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান না করেন যদি পরস্পর মিলিত না হন, যদি একে অন্যের সহায়তা না করেন, যদি পরস্পর পরস্পরের সহায়তা না করেন, যদি দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া না দাঁড়ান, তবে এ দেশের উন্নতির আশা যে সুদূরপরাহত—অসম্ভব! দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং সম্পত্তিশালী জমিদারগণের পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি নিতান্ত দরকার এবং তাহা হইলে দেশ উন্নত হইতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয় সিঁড়ি হইল দেশের জমিদার মহাশয়গণের সহানুভূতি লাভ করা। তাঁহাদের যদি সহানুভূতি পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে শিক্ষা বিস্তার যে দরকার একথা যদি ভাল করিয়া বুঝান যায়, তাঁহা-দিগকে যদি শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসাহিত করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষা বিস্তার ব্যাপারটা অতিশয় সোজা হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাদিগকে অবাধে শিক্ষা লাভের জন্য উৎসাহিত করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহাদের সহানুভূতি নিতান্ত দরকার এবং তাহা করিতে পারিলেই শিক্ষা বিস্তারের

দ্বিতীয় সিঁড়ি অতিক্রম করা হইল। শিক্ষা বিস্তারে যদি দেশীয় জমিদারগণ সহায়তা করিতে প্রস্তুত হ'ন, তবে এই দ্বিতীয় সিঁড়িতেই সম্পূর্ণ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক মৌজায় মৌজায় এবং প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে যাহাতে শিক্ষার স্রোত প্রবল বেগে পরিচালিত হইতে পারে, তন্মত বন্দোবস্ত তাঁহারা অবাধে করিতে পারেন। অতএব জমিদারগণের সহানুভূতি লাভ করা, আপামর সাধারণের অন্ততঃ সামান্য রূপ লেখা পড়া শিখা যে দরকার একথা তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝান এবং তাঁহারা যাহাতে সর্ব্বান্তঃ-করণে সাহায্য করেন তাঁহাদিগকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সেরূপ ভাবে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য।

আর তৃতীয় সিঁড়ি হইল সমগ্র জনসাধারণকে শিক্ষা লাভের জন্য জাগাইয়া তোলা। তাঁহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলে, শিক্ষা লাভের জন্য একটা উত্তেজনা তাহাদের ভিতর প্রবেশ করাইতে পারিলে, শিক্ষালাভের জন্য তাহাদের প্রবল একটা বাসনায় বশীভূত করিতে পারিলে, শিক্ষা বিস্তারের পথ একবারে প্রশস্ত হইল। তাহা হইলেই তৃতীয় সিঁড়ি অতিক্রম করা হইল। এই তৃতীয় সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইলে কয়েক জন সুশিক্ষিত সুবক্তা প্রচারকের প্রয়োজন। তাঁহারা দেশের সকল স্থানে উপস্থিত হইয়া সকল স্থানে সভা সমিতি সমাহূত করিয়া সকলের নিকট সমান ভাবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার সুবিধা, শিক্ষায় কিরূপে ইহাদিগের সুবিধা করিবে, শিক্ষা কিরূপে ইহাদের সাহায্যকারী

হইবে এ সমুদয় বুঝাইয়া বলিয়া দিবেন। সুস্থির ভাবে শুদ্ধ, শান্ত চিত্তে সকলের নিকট তাহাদের লেখা পড়া শিখা নিতান্ত দরকার একথা বুঝাইয়া বলিবেন। শিক্ষা সকলেরই আপন আপন কাজ কর্ম্মে, ব্যবসা বাণিজ্যে কিরূপে তাহাদের উপকারে আসিবে, তাহা-দের দৈনন্দিন জীবনে তাহারা কিরূপে ইহা দ্বারা উপকার উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহা একাধিক বার তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা শিক্ষা লাভের জন্য উৎসাহিত হইতে পারে। এবং তৎপর কিরূপে তাহারা বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহাও তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিলে মন্দ হয় না; কিন্তু এখানে তৎপূর্ব্বে তাহাদিগকে লেখা পড়া জানার উপকারিতা কি তাহা বিশেষ রূপে বলিয়া দিতে হইবে এবং প্রত্যেকেরই যে লেখা পড়া জানা নিতান্ত দরকার এবং যত শীঘ্র হয় তাহা করা উচিত ইহা তাহাদিগকে একাধিক বার বলিয়া বুঝাইতে হইবে, তবে তাহাদের লেখা পড়া শিখিবার জন্য একটা ইচ্ছা জন্মিবে এবং প্রাণে একটা উৎসাহ আসিবে। ইহা করিতে পারিলেই কার্য্যক্ষেত্র সুপরিষ্কৃত এবং সুন্দর রূপে প্রস্তুত করা হইল। বাকী তবে রহিল কেবল বুনানী।

শিক্ষা বিস্তারের ব্যয় কে বহন করিবে?

এ দেশ গরিবের দেশ, এখানকার জনসাধারণ অতিশয় গরিব। অনেকের প্রতিদিন গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান অতি কষ্টে হইয়া থাকে। এ'টী গরিবের দেশ, প্রতিদিন পেট ভরিয়া তাহারা খাইতে পায় না।

পয়সা ব্যয় করিয়া পড়া শুনা করা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যেখানে কৃষকের আট কিংবা দশ বৎসরের ছেলের আট আনা কিংবা দশ আনা মাসমাহিয়ানায় উদরান্নের জন্যে চাকরীতে লাগিতে হয়, সেখানে কৃষকেরা কিরূপে অর্থব্যয় করিয়া সন্তানদিগকে শিক্ষার জন্য তাহারা পাঠশালায় পাঠাইতে পারে? তাহা সম্ভবপর হয় না, কাজে কাজেই কৃষকেরা সন্তানদিগকে শিক্ষার জন্য পাঠশালায় পাঠাইতে পারে না। সুতরাং লেখা পড়া শিক্ষা করাও তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহাই হইল এ দেশী লোকের আ'জ পর্য্যন্ত নিরক্ষর রহিবার কারণ। লিখিতে পড়িতে শিখিলে তাহাদের যে বিশেষ সুবিধা হইবে একথা যে তাহারা বুঝে না তাহা নয়, এবং লেখা পড়া না জানায় বর্ত্তমানে তাহারা যে অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে ইহা যে তাহারা অনুভব করিতে অক্ষম তাহাও নহে; কিন্তু উপায় নাই, তা'ই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহা হইলে সেই দেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই বুঝিতে হইবে তাহারা পয়সা দিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না। যদি অবৈতনিক পাঠশালার সৃষ্টি হইতে পারে তবেই তাহারা নাক কাণ বন্ধ করিয়া দুই, তিন কি চা'র বৎসর সন্তানগণকে পাঠশালায় পাঠাইতে পারে, নতুবা নয়। জনসাধারণের পয়সা দিয়া পড়িবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাহাদের বিদ্যালাভের উপায় অবৈতনিক করিতে হইবে। কিন্তু খরচ দেয় কে? এ যে অজস্র টাকার দরকার?

এখানকার জনসাধারণ অতি দরিদ্র। তাহারা মাসে মাসে ত

দূরের কথা, বৎসরে বৎসরে কিংবা এমন কি পাঁচ বৎসরে কি দশ বৎসরে একবার কিছু কিছু করিয়া দিতে অসমর্থ কিন্তু একবারে মরিয়া বাঁচিয়া যে রূপে হো'ক দু' চা'র টাকা যে দিতে না পারে তাহা নহে। কেননা, এক মাস ত এক জনে অসুখ হইয়া পড়িয়াও থাকে? গ্রাম্য ডাক্তারের দর্শনীও ত একটা টাকা দেয়? দুই নাইনের পয়সাও ত পকেট হইতে দিতে হয়? সুতরাং মনে হয় তাহারা ইচ্ছা করিলে যে একযোগে কিছু দিতে না পারে, এমন নহে। একবারের কথা হইলে তাহারা না হয় দু'দিন উপবাস করিয়াও যাহা কিছু সম্ভব যতটা পারে দিতে পারে; কিন্তু বারে বারে হইলে পারে না। যদি তাহাদের এরূপ সত্য করিয়া বলা যায় যে তাহাকে আর কখনও কিছু দিতে হইবে না, একবার যাহা কিছু দিতেছে তাহাতেই তাহার ছেলেরা সকল সময়েই বিনা বেতনে পড়া শুনা করিতে পারিবে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে যে কিছু কিছু কতকটা না লওয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু এ কথা তাহাদিগকে সত্য করিয়া বলিতে হইবে।

আমাদের দেশে প্রায় ত্রিশ কোটী লোকের বাস। ইহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে একটী করিয়া টাকা আদায় করিলেও প্রায় ত্রিশ কোটী টাকা। আর এই প্রত্যেকের এক টাকা যদি একবারে আদায় হওয়াও সম্ভবপর না হয়, তবে দুই, তিন, চা'র কিংবা পাঁচ বারে আদায় হওয়া অসম্ভব নহে। যাই হো'ক, প্রতি জনের নিকট হইতে একটী করিয়া টাকা আদায় করিলেও ত্রিশ

কোটী টাকা। এই ত্রিশ কোটী টাকা যদি কোনরূপ ব্যবসায়, বাণিজ্যে কিংবা কারবারে খাটান যায় তবে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে প্রতি বৎসর সাড়েসাত কোটী টাকা মুনফা হইতে পারে। এই ভারতবর্ষে মোটের উপর ন্যূনাধিক প্রায় ছয়লক্ষ গ্রাম আছে। প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালার সৃষ্টি করিতে হইলে ছয়লক্ষ পাঠশালা করিতে হয় এবং ইহার প্রত্যেক পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের মাহিয়ানা দশটাকা হিসাবে প্রতি বৎসরে একশত কুড়ি টাকা প্রত্যেকটী পাঠশালার জন্য আবশ্যক। তাহা হইলে ছয়লক্ষ পাঠশালার খরচের জন্য প্রতিবৎসর সাত কোটী কুড়িলক্ষ টাকা দরকার। আমাদের ত্রিশ কোটি টাকা মূলধনের বার্ষিক আয় সাত কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে দেখা যায় প্রতি বৎসর আমরা প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ বাদে শিক্ষা-ভাণ্ডারে জমা করিতে পারি এবং এই ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে পরিদর্শনের জন্য যে সমুদয় লোক রাখা প্রয়োজন তাহা চলিতে পারে। প্রত্যেকটী পাঠশালা বৎসরে দুইবার করিয়া পরিদর্শন করিতে হইলে, ছয় লক্ষ পাঠশালা পরিদর্শন করিতে ন্যূন পক্ষে এক হাজার পরিদর্শক দরকার। আর তাহাদের মাহিয়ানা পঞ্চাশ টাকা হিসাবে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বৎসরে ছয় লক্ষ টাকা খরচের প্রয়োজন। আমাদের উদ্বৃত্ত ত্রিশলক্ষ টাকা হইতে পরিদর্শনের জন্য ছয়লক্ষ টাকা খরচ হইয়াও চব্বিশ লক্ষ টাকা তহবিলে থাকিতে পারে এবং এই চব্বিশ লক্ষ টাকা হইতে অন্যান্য যে সমুদয় খরচখরচা দরকার তাহা

অবাধে চলিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায় যদি আমরা কোনরূপে কষ্টে শ্রেষ্টে দেশের লোকসংখ্যার জনপ্রতি একটাকা আদায় করিতে পারি এবং সেই টাকা উপযুক্ততার সহিত ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্প প্রভৃতিতে খাটাইতে পারি, তাহা হইলে স্বদেশে শিক্ষাবিস্তার করা অসম্ভব হয় না এবং যদি আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বাসের সহিত কাজ করি তবে ইহা অতি সহজসাধ্য বলিয়া ।

কিন্তু এখন কথা এই যে আমরা এই ত্রিশকোটী টাকা কিরূপে আদায় করিতে পারি? প্রত্যেকের নিকট এক টাকা হিসাবে আদায় করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই এক টাকা হিসাবে আদায় করায়ও অনেক অন্তরায় রহিয়াছে। তাহার প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই যে দেশী লোকে এখন আমাদিগকে আর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়। বিশ্বাস থাকিলে এক টাকার যায়গায় দু'টাকাও আদায় করা তেমন মুস্কিল হইত না। যদি স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা এই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতাম, তাহা হইলে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বড় বেশী কোন বেগ পাইতে হইত না। কেননা, লোকে তখন আমাদিগকে বিশ্বাস করিত। আমরা তাহাদিগকে যাহা বলিতেছিলাম তখন তাহারা তাহাই শুনিতেছিল, এবং যতটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছিলাম তাহারা ততটুকু ত্যাগ করিতে অপ্রস্তুত ছিল না। এই প্রস্তাব তখন করিলে, ইহা সেই দিনে—সেই সময়ে, বিশেষ কোন বাধা না পাইয়া সম্পাদিত হইতে পারিত। কিন্তু

এই দুর্দ্দিনে—বিশেষ যেহেতু আমরা লোকের বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি, তখন এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? জনসাধারণ কি আর আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিবে? আর কি তাহারা বিশ্বাস করিয়া আমাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের হাতে এত টাকা সমর্পণ করিতে পারে? পারে না। তবে কিরূপে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? এক কথা বলিব, যদি একবার আমরা কিছু কাজ করিতে পারি তবে দেশী লোকের আমাদের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে এবং তাহা হইলেই যদি সম্ভবপর হয়। কিন্তু সেও ত—সেই সামান্য একটু কাজও ত টাকা না হইলে হইতে পারিবে না। যদি সামান্য একটু কাজ করিয়াও দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতে যাই তাহা হইলে সেই সামান্য কাজটুকুর জন্যও টাকার দরকার হইবে এবং সেই টাকা কোথায় পাইব? কে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে প্রয়াসী হইবে? আশা করিতে পারি কি যে দেশের মহৎ ব্যক্তিরা আরও একবার আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন? অবশ্য একথা ঠিক, আমরা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের আর এমন কিছুই বলিবার নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া ভারতবাসী জনসাধারণে আমাদের হাতে সামান্য অর্থও অর্পণ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি মনে হয়, এই ভারতভূমি এখনও এরূপ মহজ্জনগণ শূন্য হয় নাই যে আমাদিগকে আর একবার কার্য্যক্ষেত্রে, তাহাদের চিত্তের তুলনায়, এই সামান্য অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে

পারে না। এই ভগবান্-বাঞ্ছিত ভারতভূমে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা এই ব্যাপার আরম্ভ করিতে যে টাকার দরকার হইবে তাহা অকাতরে দান করিতে পারেন। ভারতবর্ষ গরিব হো'ক তথাপি এখানে এমন ধনী এখনও আছেন, যাঁহারা টাকাকে অতি তুচ্ছ পদার্থ মনে করিয়া থাকেন—যাঁহারা টাকাকে তেমন কিছু মনে করেন না। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি এই আরম্ভের জন্য যে অর্থের দরকার হইবে তাহা পাওয়া একবারে অসম্ভব হইবে না।

তা'রপর আরও এক কথা এবং সেইটী মূল এবং প্রধান কথা। আমরা যদি বাস্তবিকই এই শিক্ষা বিস্তার করা কর্ত্তব্য বোধ করি, বাস্তবিকই যদি ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়,আর যদি প্রকৃত-পক্ষে আমরা প্রাণের সহিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হই, যদি আমরা এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তাহা হইলে যদিও আমরা দেশী লোকের বিশ্বাস হারা হইয়াছি, আবার তাহারা বিশ্বাস করিবে এবং তাহাদেরই নিকট হইতে পুনরায় টাকা জুটাইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইব। তাহা হইলে এখন কথা হইল আমাদের দৃঢ়তা এবং কার্য্যকারিতা লইয়া। আমরা যদি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হই, আমাদের যদি কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে, যদি যথার্থই আমরা কাজের লোক হইয়া থাকি, যদি মন আমাদের যথার্থই এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে, যদি আমরা মন প্রাণে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হই, তবে অবশ্য দেশী লোকে পুনরায় আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে এবং পুনরায় তাহারা অবশ্য অবশ্য আমাদের হাতে টাকা দিবে—

আমরা নিশ্চয়ই এই টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব। ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়, বাসনা থাকিলে পরিতৃপ্তি হয়, উদ্দেশ্য থাকিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি আমরা প্রাণবিনিময়ে পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত হই, যদি আমরা একাগ্রচিত্তে এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। মন থাকিলে মনের বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সুতরাং উন্মেষে আমাদের হতাস হইবার কিছুই নাই, উপক্রমেই আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই এবং প্রারম্ভেই আমাদের ভগ্নহৃদয় হইবার কোনই মানে নাই। যদি আমাদের প্রাণ থাকে, যদি আমরা প্রাণবিনিময়ে কার্য্য করিতে থাকি, যদি আমরা অকৃত্রিম উদ্যমে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হই, যদি আমরা অটুট উৎসাহে অগ্রসর হইতে থাকি, যদি আমরা অসীম অধ্যবসায়ের সহায়তা লইয়া অগ্রসর হইতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের পশ্চাৎপদ হইবার, আমাদের নিরুৎসাহ হইবার বা আমাদের ভগ্নোৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই। আমরা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব—এই মহৎ উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

আর তা'রপর আমরা আরও এককাজ করিতে পারি। আমরা এইজন্য গভর্ণমেণ্টের নিকটও সামান্য সাহায্য যে প্রার্থনা না করিতে পারি তাহাও নহে। আমাদের দেশীয় মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ যেরূপ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিতেছে, আমরাও সেইরূপ করিতে পারি। তাহারা যেরূপ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ধার করিয়া কার্য্য সম্পাদন করি-

তেছে আমরাও তদ্রূপ করিতে পারি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এইরূপে সাহায্য করিতে কিছুতেই রাজী না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটীকে কর্ম্মচারী ধার দিয়া যেরূপ ভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, যদি আমরাও গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা জানাই তাহা হইলে আমার বিশ্বাস যেরূপভাবে সেখানে সাহায্য করিতেছেন এ ক্ষেত্রেও ঐরূপভাবের এই সাহায্য অবশ্যই করিবেন। এরূপ বিশ্বাস আমরা নিঃসন্দেহে করিতে পারি। কেননা, আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সাহায্য না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারেন না। আর যদি আমরা গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ধার করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মসাধনে অনেক সুবিধা হইবে। লোকের বিশ্বাস—জনসাধারণে বিশ্বাস আমরা সহজেই ফিরিয়া পাইতে পারিব এবং কৃতকার্য্য হওয়ারও একটা নিশ্চয়তা থাকিবে। অতএব এ পথও আমাদের অবশ্য পরিগ্রহণীয়।

তা'রপর আর যেরূপ যাহা দরকার, যেখানে যে অবস্থায় যাহা করা প্রয়োজন এবং সম্ভব, তাহা অবশ্য করিতে হইবে। সে সমুদয় বিস্তৃত করিয়া কোনরূপ কিছু বলা বা লিখা এখন অসম্ভব। সে সব "ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে" ইহার উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং সেই সব বিষয় এখন ভাবিতে কিংবা বলিতে যাইয়া বৃথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা সঙ্গত মনে হয় না।

যাহা হো'ক, এখন আসল কথা আমাদের দৃঢ়তা লইয়া। সেইটী

সর্ব্বাগ্রে দরকার। প্রথমে আমাদের দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে আমরা কি চাই এবং যাহা চাই তাহাও পাইবার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিনা? যদি আমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হই, তবে পাইবার মত পথগুলিও অবশ্যই আস্তে আস্তে প্রশস্ত হইয়া আসিবে। যদি আমরা কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকি, সত্য সত্যই যদি আমাদের কার্য্য করিবার অভিলাষ জাগ্রত হইয়া থাকে, যদি আমরা সত্য সত্যই প্রাণের সহিত চাই, তবে আমরা নিশ্চয়ই পাইব, তাহাতে কোনরূপ অন্যথা হইবে না। এখন তাহা হইলে অতি প্রথমে জিজ্ঞাস্য আমরা চাই কিনা? দ্বিতীয় কথা—যদি আমরা চাই, তবে তাহা পাইতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিনা? যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই তবে কোনও বাধাবিঘ্নই আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। যদি ঈপ্সিতলাভ করিতে যথার্থই আমরা যত্নবান হই, তবে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিব। যদি আমরা বাস্তবিকই মনপ্রাণে কার্য্য করিতে থাকি, যদি আমাদের মন যথার্থই প্রাণের সহিত অভিলষিত পাইতে প্রয়াসী হয়, যদি আমরা দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে থাকি এবং পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন আসিয়াও উপস্থিত হয় তাহাও আমরা অবাধে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব, তাহাতে আমরা কিছুতেই—কোনক্রমেই পশ্চাৎ-পদ হইব না। ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা নিতান্ত প্রয়োজন ;---এদেশী জনসাধারণ লিখিতে পড়িতে শিখে ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতবাসীর নিরক্ষরতা দূর করা নিতান্ত দরকার, আমরা ইহা চাই, কিন্তু তজ্জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা

করিতে আমরা প্রস্তুত আছি কিনা তাহাই এখন এবং সর্ব্ব প্রথমে ভাব্য এবং বিবেচ্য। যদি আমরা বাস্তবিক পক্ষে প্রস্তুত থাকি, যদি যথার্থই আমরা ইহার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তবে আমরা নিশ্চয়ই এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইবই হইব। যদি আমাদের উদ্দেশ্য থাকে এবং উদ্দেশ্যকে যদি কিছুতেই ছাড়িয়া না দিই, তবে একদিন উদ্দেশ্য আমাদের ক্রীতদাস হইবে। একটী কথা আছে "যদি থাকে আশ, আর যদি না ছাড়ে পাশ, তবে হয় তার দাসের দাস।" এ কথাটার মানে এইরূপ :—একদিন এক ব্রাহ্মণ রাত্রে নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন তিনি উপবন ভ্রমণকালে একখানি শিলাখণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহা কুড়াইয়া লইতে দৈববাণী হইল "তুই আমাকে নিস্ না, তো'র সর্ব্বনাশ হইবে।" কিন্তু ব্রাহ্মণ শিলাখণ্ডকে শালগ্রাম মনে করিয়া দৈববাণী উপেক্ষা করত শালগ্রাম রক্ষায় এবং শালগ্রাম পূজায় নারায়ণের সন্তুষ্টি সাধন হয় জানিয়া এবং তৎফলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া শালগ্রামটীকে তুলিয়া লইলেন এবং তাহার ফলে তাহার সর্ব্বনাশ হইল।" এই স্বপ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণ একটু বিচলিত হইলেন। যা'ই হ'ক পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে ব্রাহ্মণ গৃহের অনতি-দূরে উপবনে বেড়াইতে গেলেন এবং যথার্থই একখানি শিলাখণ্ড দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ শালগ্রাম ভাবিয়া শিলাখণ্ডকে তুলিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শিলাখণ্ডকে যথারীতি সংস্কার করিয়া যথাবিহিত পূজা করিলেন এবং তাহার ফলে তার পরদিন হইতেই তাঁহার কিছু কিছু ক্ষতি হইতে লাগিল এবং

সপ্তাহের ভিতরে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে দৈববাণী হইতে লাগিল "তুই আমাকে আমি যেখানে ছিলাম তথায় রাখিয়া আয়, নতুবা আমি তো'র সর্ব্বনাশ করিব।" ব্রাহ্মণ এসব ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, তিনি যথাবিহিত তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি-ধন সম্পদ্ জমি জমা যাহা কিছু ছিল সমস্তই হারাইয়া ফেলিলেন এবং অবশেষে একমাত্র প্রিয়তম পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল। তখন আবারও পূর্ব্বরূপ দৈববাণী হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ সে দিকে আর বারেকও ফিরিয়া তাকাইলেন না। দৈববাণী মিথ্যা হইল না। বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল সমস্তই গিয়াছে এবং অবশেষে সেই একমাত্র প্রিয়তম পুত্রও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তাহাতেও অধীর হইলেন না। কিন্তু ইহার আর দুই একদিন পর পুত্র শোকাতুরা জননী পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন নারায়ণ বগলে করিয়া বনবাসে চলিয়া গেলেন।

এক, দুই, তিন করিয়া বনমধ্যে তাঁহার ছয় দিন কাটিয়া গেল। সপ্তম দিবসে তিনি পথশ্রান্ত হইয়া বনমধ্যস্থ পথের ধারে একটী বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন এবং শ্রান্তিনিবন্ধন অচিরকাল মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইলেন। তখন নিদ্রাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, "ব্রাহ্মণ, শিলাখণ্ড পরিত্যাগ কর, নতুবা তোমার সর্ব্বনাশ করিব।" ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিলেন, আমার আর কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু

পুনরায় শুনিলেন, "তুমি প্রাণ হারাইবে।" ব্রাহ্মণ আবার উত্তর দিলেন, মরিতে ত হইবেই! মৃত্যু ত আমার বাধ্য নয়? সে ত আর আমার হাত নয়? কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করা আমার কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিতে পারি। কিন্তু মৃত্যুকে ত বাধা দেওয়া আর আমার সাধ্য নয়! জন্মেছি যখন তখন মরিতে হইবেই! তজ্জন্য আর ভাবিবার কি আছে? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ শুনিলেন ' তবে মর।" ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি জাগিয়া দেখিলেন তিনি কতগুলি হিংস্র জন্তুতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, সকলেই যেন মুখব্যাদান করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনার সূচনা হইল। একটী রাজহস্তী আসিয়া শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন করিয়া ব্রাহ্মণকে তাহার পৃষ্ঠে লইয়া বিদায় হইল। শ্বাপদেরা তদ্দৃষ্টে যেন অবাক্ হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

যাহা হ'ক, হস্তীটী ব্রাহ্মণসহ বনাতিক্রম করিয়া এক রাজপুরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া বহু লোকজন আসিয়া হস্তী সমীপে উপস্থিত হইল। অল্পকাল মধ্যে ব্রাহ্মণ লোকজন কর্ত্তৃক অন্তঃপুরস্থিত রাজকুমারীর সম্মুখে নীত হইলেন। ব্রাহ্মণ রাজকুমারীর সমীপে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলে পর তিনি তাঁহাকে তাহার সমুদয় পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ তদুত্তরে আপনার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন। রাজনন্দিনী সে সমুদয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ঐ শিলাখণ্ড পরিত্যাগ কর, আমি তোমাকে এই স্বরাজ্য সিংহাসন দিতেছি এবং আমি স্বয়ং তোমার

পদ-সেবায় নিযুক্ত হইতেছি।" ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিলেন, "আমি রাজ্য কিংবা রাজসিংহাসনও চাহি না, শিলাখণ্ডও পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" কুমারী ক্রোধিতা হইয়া বলিলেন "তবে আমি তোমার প্রাণনাশ করিব।"

ব্রাহ্মণ। দেবি, কি অপরাধে আপনি আমার প্রাণ বিনাশ করিবেন?

রাজকুমারী। প্রথমতঃ তুমি রাজাদেশ লঙ্ঘন করিতেছ, দ্বিতীয়তঃ তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছ এবং তৃতীয়তঃ তুমি আমাকে বিনা দোষে বিধবা করিতেছ।

ব্রাহ্মণ। প্রথম কারণ সম্বন্ধে অবশ্য আমার কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার এই প্রার্থনা, আমি কিরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং বিনা দোষে বিধবা হওয়ার কারণ হইলাম জানিতে পারিলে অনুগৃহীত হইব।

রাজকুমারী—আমার প্রতিজ্ঞা—রাজহস্তী যাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া আসিবে তাহাকেই এই রাজ্য এবং রাজসিংহাসনের অধিকারী করিব এবং তাহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব। তাহা হইলে দেখিতেছ তুমি আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতেছ। শুধু তা'ই নয়, যেহেতু হিন্দু স্ত্রীলোকেরা একবার যাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পুনরায় পতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা হইলে তুমিই কি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং চিরবৈধব্যের কারণ নও?" ব্রাহ্মণ ইহার উত্তরে আর কিছু বলিতে পারিলেন না। রাজকুমারী তখন আবার

তাঁহাকে অনুনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, শিলাখণ্ড পরিত্যাগ কর, রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজা হও; রাজকুমারী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। ইহা কি তোমার বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না? ব্রাহ্মণ তদুত্তরে পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "রাজকুমারি ক্ষমা করুন, আমি শিলাখণ্ড কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" রাজকুমারী তখন ক্রোধে অধীরা হইয়া কহিলেন, "তবে তুমি গোল্লায় যাও" এবং তদ্দণ্ডেই আদেশ করিলেন "এই অপরিণামদর্শী ব্রাহ্মণকে কয়েদ কর।" ব্রাহ্মণ তখন কয়েদখানায় প্রেরিত হইল।

সেখানে দুই এক করিয়া দশমাস কাটিয়া গেল। রাজ্যের উজির নাজির পাত্রমিত্র সকলে আসিয়া ব্রাহ্মণকে কতরূপে বুঝাইয়া শিলাখণ্ড পরিত্যাগ করত রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অচল, অটল ভাবে, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলেন না। তিল তিল করিয়া তাঁহার মৃত্যু দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অবশেষে একদিন তিনি বধ্যভূমিতে আনীত হইলেন। তথায় তাঁহার গর্দ্দান লওয়া হইবে। সমস্তই প্রস্তুত, জল্লাদ খাঁড়া হস্তে তৎসমীপে দণ্ডায়মান, ব্রাহ্মণ নিমীলিত নেত্রে নারায়ণধ্যানে মগ্ন। ইতিমধ্যে একটী আকস্মিক ঘটনার সংঘটন হইল, কোথা হইতে একটী অতি বড় পক্ষী আসিয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল। সমবেত জনমণ্ডলী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে পক্ষিরাজ কোন

আকাশে উড়িয়া গেল। এদিকে রাজকুমারী তচ্ছ্রবণে আশায় নিরাশ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে বসিয়া পড়িলেন।

যাহাই হ'ক, পক্ষিরাজ ব্রাহ্মণকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া আকাশ-পথে উড়িতে উড়িতে কি এক আশ্চর্য্য প্রদেশে উপস্থিত হইল। সেখানকার হাওয়ায় ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কি এক নূতন ভাবের উদয় হইল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সকলেই হর্ষোৎফুল্ল, কাহারও মুখে বিমর্ষের ছায়ামাত্র দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ "কোথায় আসিলাম, এ কা'র রাজ্য? এখানে কি লোক চিরসুখী? এখানে কি অসুখ অশান্তির লেশমাত্র নাই?" নীরবে বসিয়া ইত্যাদি ভাবিতেছেন এমন সময় ৫'টী ষোড়শী সুন্দরী যুবতী আসিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আসন প্রস্তুত, চলুন।" ব্রাহ্মণ তাহাদের রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, আনন্দিত মনে কহিলেন, "দেবি, আমি যে আগন্তুক, কোথায় যাইতে হইবে?" তদুত্তরে যুবতীদ্বয় কহিলেন, "চলুন আমরা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি।" ব্রাহ্মণ তখন আস্তে আস্তে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে একখানি সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সম্মুখে সুন্দর একখানি সিংহাসন স্থিত রহিয়াছে। আর যে পক্ষীটী তাঁহাকে বধ্যভূমি হইতে লইয়া পলাইয়াছিল সেও তথায়ই দণ্ডায়মান। ব্রাহ্মণ, সিংহাসনের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন সিংহাসনে একখানি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অবস্থিত এবং তৎপার্শ্বে সেই ষোড়শী যুবতী দ্বয়ও অবস্থিতা। ব্রাহ্মণ করযোড়ে প্রণিপাত করিলেন। সিংহাসনস্থিত মূর্ত্তিখানি

তখন কহিলেন, "ঠাকুর, আমার শিলাখণ্ড আমাকে দিতে পার?" ব্রাহ্মণ বগলে হাত দিয়া শিলাখণ্ড না পাওয়ায় বিস্মিত ও বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন—দেখিলেন—জানিতে পারিলেন তাঁহার কক্ষস্থিত শিলাখণ্ড শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিখানি হইয়া সম্মুখের সিংহাসনে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত। তখন তিনি জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণু তাঁহাকে কহিলেন, "ঠাকুর" আমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং তোমার জন্য এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। তুমি এইখানে অবস্থান কর, ইহাই তোমার বাসস্থান। ব্রাহ্মণ তখন করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমি যে এক রাজকন্যার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ হইয়াছি, তাহার কি গতি হইবে? নারায়ণ যদি তাহার গতি না করেন, তবে এই সিংহাসন—এই বিষ্ণু লোক, ইহা আমি চাই না। নারায়ণ তাঁহার এবংবিধ উত্তরে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি সে ভাবনাও ভাবিয়া রাখিয়াছি। তাহারও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপে পাপী হইতে হয় নাই। সে রাজকুমারীও অচিরকাল মধ্যে তোমার সমীপে আনীত হইবে। তুমি এখন এই আসনে উপবেশন কর।" ব্রাহ্মণ তাহাতে রাজী হইলেন না, কিন্তু নারায়ণ তখন তাঁহার হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। ব্রাহ্মণ অগত্যা উপবেশন করিলেন এবং তৎপার্শ্বে তন্মুহূর্ত্তে রাজকুমারীকে অবস্থিতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নারায়ণ

নারায়ণী তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ সদানন্দে বৈকুণ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন।" বাস্তবিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার এমনি ফলই বটে। উপরোক্ত গল্পটী যদিও উপকথা, তথাপি ইহাতে যে উপদেশ যথেষ্ট রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রতিজ্ঞা পালনে কৃতসঙ্কল্প হইলে তাহার ফল যে এইরূপই সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেকই রহিয়াছে।

গয়াসুর।

ত্রিপুরাসুরতনয় গয়াসুর মাতৃমুখে দেবতাগণ কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে ত্রিপুরাসুরের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং দেবতারাই তাঁহার মায়ের যত দুঃখের কারণ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে রূপেই হউক সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইবেন। তৎপরে বনে গিয়া সেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক অসীম অধ্যবসায়ের সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া সে কাহার পদ কাড়িয়া লইবে মনে করিয়া তাঁহার বিনাশের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ধ্যানমগ্ন বালকের সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। সকলেই ত্রস্তব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কাহার বা কোন্ পদ যায়! যাহাই হো'ক, কঠোর তপস্যার বলে তাহার তপস্যায় দেবতাগণকে তাহাদের অন্যায় চেষ্টা হইতে বিরত করিলেন। কেহই তাহার তপস্যায় আর কোন বাধা জন্মাইতে পারিল

না। যাহাই হো'ক, অবশেষে তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে তিনি ত্রিপুরবিজয় করিতে পারিবেন,এরূপ বর দিয়া প্রস্থান করিলেন। গয়াসুর তৎপর সমুদয় দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অবশেষে স্বয়ং বৈকুণ্ঠ-বাসী বিষ্ণুকেও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু তিনিও গয়াসুরের সহিত যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং অবশেষে কৌশলচ্ছলে তাঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। গয়াসুর তদুত্তরে কহিলেন "আমি বিজেতা আর তুমি বিজিত ; তুমি কি প্রকারে আমাকে বর দিবে? আমি বরং তোমাকে বর দিতে পারি! তুমি প্রার্থনা কর, আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব!" বিষ্ণু অমনি বর চাহিলেন, বলিলেন, "তবে তুমি এইখানে পাষাণ-রূপে অবস্থান কর, ইহাই আমার প্রার্থনা।" গয়াসুর বিষ্ণুর কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনিও তন্মুহূর্ত্তে বর চাহিলেন "তুমি চিরদিন আমার মস্তকে তোমার ঐ চরণ রাখিবে এবং ঐ চরণে পিণ্ডদান করায় যাহার যে কেহ যে ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হো'ক না কেন, তাহারা সকলেই বৈকুণ্ঠবাসী হইবে। যমের তাহাদের উপর কোন অধিকার থাকিবে না।" বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং তদবধি গয়াধামের সৃষ্টি হইল। আ'জও লোকে পিতৃপুরুষগণ অথবা আত্মীয়স্বজনগণের বিষ্ণুলোকে গমন কামনায় গয়াধামে গদাধর-চরণে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে।

ধ্রুব।

তারপর ধ্রুব। সুনীতি-নন্দন ধ্রুব বিমাতার অভিরুচ্যানুযায়ী পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শৈশবে পদ্মপলাশলোচন হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল বন মধ্যে অনশন অনিদ্রায় কত বৎসর তপস্যা করিলেন। কত হিংস্র জন্তু আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। কিন্তু সে সবের দিকে বালক ধ্রুব একবার ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। আপন প্রতিজ্ঞানুযায়ী আপনি তন্ময় হইয়া সেই পদ্মপলাশলোচনের ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। দেবতাগণ, তাঁহার তপস্যায় সে কাহার বা ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব কি স্বর্গ কাড়িয়া লয় এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার প্রতি নানারূপ অত্যাচার অবিচার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বালক কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। কতরূপে দেবতারা তাঁহাকে প্রতারিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। কতরূপ প্রলোভনে তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু বালক ধ্রুব কিছুতেই ভুলিলেন না। তিনি কেবল সেই পদ্মপলাশলোচনের চিন্তায় চিন্তিত রহিলেন এবং তৎফলে পদ্মপলাশলোচন তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং তাঁহার জন্য বিষ্ণুলোকের উপরে ধ্রুব লোকরচনা করিলেন। ধ্রুব অবশেষে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একলব্য।

অতঃপর একলব্য। একলব্য অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে নীচ

কুলোদ্ভব বলিয়া অস্ত্রশিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হ'ন। কিন্তু একলব্য জানিতেন দ্রোণাচার্য্যই একমাত্র অদ্বিতীয় অস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী ব্যক্তি। তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করিতে পারিলে অস্ত্রশিক্ষা সুন্দররূপে সমাধা হইতে পারে না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি বনে যাইয়া দ্রোণাচার্য্যের মৃন্ময়মূর্ত্তি গঠন করত তাঁহার নিকট অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

বহুদিন অতিবাহিত হইল একলব্য একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সাহচার্য্যে অস্ত্রবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেন। এমন সময় একদিন দ্রোণাচার্য্য কুরুগণ সহিত মৃগয়ার্থে সেই বনে আগমন করিলেন। একলব্যের সহিত কুরুগণের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কুরুগণ তাহার সহিত যুদ্ধে আঁটীয়া উঠিতে পারিলেন না, নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিলেন। তখন তদীয় গুরু তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণ করতঃ একলব্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ দ্রোনাচার্য্য পরাজিত হইলেন এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপন মনে কহিতে লাগিলেন "একি বিস্ময় কর ব্যাপার, এ যে সব আমারই শিক্ষা! কিন্তু তা' কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যা'ই হো'ক, তিনি বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তখন একলব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরবর, এ শিক্ষা তুমি কোথায় পাইলে? এরূপ অস্ত্রশিক্ষা তোমাকে কে দিয়াছে? এ কাহার শিক্ষা?" একলব্য তদুত্তরে কহিলেন, "এ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষা।" দ্রোণাচার্য্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কিরূপ! দ্রোণাচার্য্য ত

কাহাকেও এরূপ শিক্ষা দেন নাই! একলব্য কহিল "তিনি দেন নাই, কিন্তু আমি পাইয়াছি।" দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি না দিলে তুমি কিরূপে পাইতে পারিলে?" একলব্য তদুত্তরে কহিতে লাগিলেন, আমি প্রথমে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের সমীপে অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত গমন করি। কিন্তু আমি নীচজাতি বলিয়া তিনি আমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে অসম্মত হ'ন। সুতরাং তথায় নিরাশ হইয়া তৎপরে আমি এই বনে আগমন করত এই বন মধ্যে তাঁহার মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারই নিকটে অস্ত্রশিক্ষা করিতে থাকি এবং সেই শিক্ষাই এই।" দ্রোণাচার্য্য ইহা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কিন্তু কুরুগণের মঙ্গলার্থে কৌশলক্রমে তাহার নিকট গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি চাহিলেন। একলব্য তৎক্ষণাৎ ধনুকে তীর সংযোগ করত আপন তর্জ্জনী কাটিয়া গুরু দক্ষিণা প্রদান করিলেন। কুরুগণ তৎপরে একলব্যকে পরাস্ত করিয়া মৃগয়া সমাপনান্তে হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাহাই হো'ক, উক্ত ব্রাহ্মণ, গয়াসুর, ধ্রুব এবং একলব্যের চরিত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা এবং প্রতিজ্ঞা পালন সম্বন্ধে যথেষ্টই শিক্ষা করা যাইতে পারে। তাঁহাদের দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অদম্য উদ্যম, অটুট অধ্যবসায় এসব বড়ই প্রশংসনীয়। কি প্রতিজ্ঞা! প্রাণ যায় তবু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না। কি অধ্যবসায়! কিছুতেই দমিবার নয়!

এ সব ত সেকালের কথা। একালেও যে এরূপ দৃষ্টান্ত দুই চারিটা মিলিতে পারে না তাহা নহে। নেপোলিয়ান বোনা পার্ট একজন দরিদ্র উকিলের ছেলে মাত্র ছিলেন। তিনি ষোল

বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহার বয়স অতি অল্প বলিয়া যখন তাঁহাকে পরীক্ষা লইতে আপত্তি করে,তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি জানি আমি কি, আর আমি কি শিখিয়াছি। কিন্তু যা'ই হো'ক, আরও এক বৎসরকাল অপেক্ষা করা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক ; সুতরাং আমি আরও এক বৎসর এই শ্রেণীতে অপেক্ষা করিব।" তা'রপর তিনি বৎসরান্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে ফ্রান্সের সৈন্যবিভাগে আর্টিলারি ডিভিসনে নিযুক্ত হইয়া স্পেন দেশে প্রেরিত হ'ন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ইতালীতে গমন করেন। তথায় 'জেনোয়া' দখল করিবার সময় তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট স্থানে তোপ বসানের ফলে জেনোয়ার পতন হয় এবং সর্ব্ব প্রধান সেনাপতির তাঁহার দিকে বিশেষ একটু দৃষ্টি পড়ে এবং তাহারই ফলে পুনরায় যখন ইটালিতে সৈন্য প্রেরণ করা হইল এবং কেহই তাহার নেতৃত্বা করিয়া সুবিধা করিতে পারিলেন না, তখন বোনাপার্টকে পাঠান হইল। যুবক নেপোলিয়ান ইটালীতে ফরাসী সৈন্যসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পরে, ফরাসী সৈন্যগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের উপর এক বাক্যে সকলে বলিয়া উঠিল, এখন বালক আমাদিগকে বহন করিবে ?" কিন্তু নেপোলিয়ান তখন কোন একটী কথাও কহিলেন না। কিন্তু তৎপর দিন যুবক নেপোলিয়ন যখন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ, আমি তোমাদিগকে সোণার মুলুকে লইয়া যাইব, সোণা খাওয়াইব এবং সোণা পরাইব। সুফলা ইটালীর পিড্‌মণ্ট প্রদেশে পৌছিয়া

আমার কথার সত্যতা সম্প্রমাণ করিতে পারিবে। এখন চল আমরা আস্তে আস্তে সেইদিক্ বলিয়া অগ্রসর হই।" সৈন্যগণ তখন কি জানি এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া বিদ্যুচ্চালিত পুত্তলির ন্যায় সেই বালক সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল এবং যথার্থই অতি অল্প সময়ে পিডমণ্টে পৌঁছিয়া তাহারা নানারূপ সুখসম্ভোগ উপভোগ করিতে লাগিল। যুবকের প্রতি তাহাদের একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল এবং তাহারা তাহার নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। নেপোলিয়ান অনেক দিন ইটালীতে রহিলেন, অষ্ট্রিয়ার সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিলেন এবং প্রতিবারেই অমিত পরিমাণে টাকা পয়সা ফ্রান্সের রাজভাণ্ডারে পাঠাইতে লাগিলেন এবং সেই টাকার দ্বারা ফরাসী সৈন্য রাইন্ প্রদেশে জর্ম্মণ সৈন্যের সহিত লড়িতে লাগিল। যাহাই হো'ক, নেপোলিয়ান অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া শেষে ফ্রান্স প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তথা হইতে মিশর আক্রমণ করিতে আফ্রিকায় চলিলেন। তথায় কয়টা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া কিয়দ্দিবস পর ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় জানিয়া আপন বাহিনী তথায়ই রাখিয়া কেবল কয়েকটী মাত্র নিতান্ত অনুগত জন সহ আপনি সাগর পার হইয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিলেন। আসিবার সময় একবারে সাগরপথে রাজধানীতে না যাইয়া দেশের মধ্য দিয়া চলিলেন এবং তথায় তিনি দেখিলেন যে যাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল, তাঁহারাই তাহাকে পুষ্পমালাদিতে বিভূষিত করিয়া উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা হইতে ফ্রান্সকে উদ্ধার করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। নেপোলিয়ান শুনিলেন,

দেখিলেন, দেশের অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইলেন এবং যাহা কর্ত্তব্য, তিনি যাহা হইতে যাইতেছেন, সমস্ত অবধারিত করিলেন।

রাজধানী প্যারিসে পৌছিয়া তিনি সোজাসোজি আপন ভবনে গমন করিলেন এবং শুনিলেন তাঁহার ভ্রাতা ডেপুটীদের সভায় বন্দী রূপে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু তিনি সেই সংবাদে কোন রূপ বিচলিত হইলেন না। কোন সরকারী কর্ম্মচারীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতেগেলেন না। আপনি আপন আলয়ে বসিয়া স্রোতের গতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজসরকারে তাঁহার প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, তাঁহার শত্রু মিত্র বন্ধু বান্ধব ও রাজ-কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে সাত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কত লোক দেখা করিতে আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। বোনাপার্ট কিছুতেই আপনাকে বাহিরে বাহির করিলেন না। সাত দিন এইরূপেই কাটিয়া গেল। অষ্টম দিন সকাল বেলায় ইটালীতে যুদ্ধ করিবার সময় যে সমুদয় জেনারেল্‌গণ তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিলেন। নেপোলিয়ান তাহাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রথমে তাঁহাদিগকেও দেখা দিলেন না। কিন্তু তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, আবার সংবাদ পাঠাইলেন;— "তবে কি আমাদের কথাও শুনিবেন না? আমরাও কি বিফল-

মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইব ?" এইবার নেপোলিয়ান বাহিরে আসিলেন। কিন্তু বিশেষ কোন কথা না বলিয়া তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সম্মান করিয়া বসিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, "জেনারেল্, এ কি ভাব ? আমাদের সঙ্গে কি আপনার এ ভাব উচিত ? আমরা কি আপনার পর ?" নেপোলিয়ান তখন আস্তে আস্তে বলিলেন, "আত্মপর আর কি বলিব ! আর, সে সব কথায় কি দরকার ?

জেনারল্‌গণ—ব্যাপারটা কি একবার খুলিয়াই বলুন না ? আমরা কি কিছুই করিতে পারি না ?

নেপোলিয়ান—অবশ্য পারেন—

জেনারেল্‌গণ—তবে কি আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন ?

নেপোলিয়ান—না, আমি আপনাদের ত্যাগ করিব কেন ? আপনারাই করিয়াছেন।

জেনারেল্‌গণ—আমরা করেছি ? আপনি বলুন, আপনার জন্য আমরা কি না কর্ত্তে পারি ? যা' আদেশ ক'র্ব্বেন তা'ই ক'র্ত্তে প্রস্তুত।

নেপোলিয়ান—তা'ই কি ? আপনাদের এই কথার উপর আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি কি ?"

নেপোলিয়ানের এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই জেনারেল্‌গণ তাঁহাহাদের স্ব স্ব কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। নেপোলিয়ান তখন হৃষ্টচিত্তে

সকলের সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং বলিলেন, "আপনারা মনে রাখিবেন আমি সম্পূর্ণ আপনাদের উপর নির্ভর করিব। আপনারাই আমার যাহা কিছু! আশা করি, কখনই আপনারা আপনাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিমুখ হইবেন না। ফরাসী হইয়া ফরাসী দেশের জন্য যাহা কিছু করা দরকার হইবে, বিনা বাক্যব্যয়ে অকৃত্রিম হৃদয়ে তাহা অবশ্য সম্পন্ন করিবেন এবং আমি ভরসা করি, আমি সর্ব্বদাই আপনাদের উপর নির্ভর ক'রতে পারিব।" জেনারেল্‌গণ তাঁহার এই উক্তিতে উত্তেজিত হইয়া সকলে সমস্বরে "নিশ্চয়ই—অবশ্যই" ইত্যাদি বলিয়া উঠিলেন। নেপোলিয়ান তখন ধীর, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জেনারেল্‌গণ, আপনারা থা'কতে আমার ভ্রাতা যোসেফ্‌ ডেপুটী-ঘরে আবদ্ধ? তাহাদের সভাপতি করিবে বলিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া অবশেষে তাহাকে বন্দী করিল! আর আপনারা—

জেনারেল্‌গণ। আদেশ করুন, এখনই তাহাকে মুক্ত করিতেছি।

নেপোলিয়ান। তবে আর কালবিলম্ব কেন? তা'ই করুন। আমিও প্রস্তুত হইতেছি।"

জেনারেল্‌গণ আর একটী কথাও না বলিয়া রওয়ানা হইলেন। অগৌণে রণভেরী বাজিয়া উঠিল. তাঁহারা অনতি বিলম্বে ডেপুটীঘর অবরোধ করিলেন, যোসেফ বোনাপার্ট মুক্ত হইলেন। এইরূপে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য সংস্থাপনের কার্য্য আরম্ভ হইল।

তা'র পর তিনি, মন্ত্রিসভায় চিরদিনের জন্য আপনার তরে প্রথম কন্‌সালের পদ প্রার্থনা করিলেন, তাহা অবাধে মঞ্জুর হইল। তিনি প্রথম কন্‌সাল হইয়া ফরাসী রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তখন আর এক বার ইটালীতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, সেই সময় আল্পস্ পর্ব্বত বরফ-আচ্ছাদিত থাকাতে তাঁহাকে ক্ষণ কালের জন্য আপন বাহিনী লইয়া তথায় অবস্থান করিতে হইল। কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁহাকে আল্পস্ পার হইতেই হইবে। যাহাতে আল্পস্ অতিক্রম করা যাইতে পারে সেরূপ বন্দোবস্ত করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে যখন বন্দোবস্ত শেষ হইল, তখন আল্পস্ অতিক্রম কালে যখন তাঁহার বিপুল বাহিনী অলঙ্ঘনীয় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিল, তখন তিনি কহিয়াছিলেন "যে, একবার তাহার মনকে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে, সে কখনও বলিবে না তাহা অসম্ভব।" অর্থাৎ যিনি কোন কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি সেইকার্য্য করা অসম্ভব এরূপ বলিবেন না। মানে, তিনি যাহা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে তাহা করিতে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন। বাস্তবিক এ কথার সত্যতাও তিনি সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সামান্য সৈনিকের পদ হইতে আপন যত্ন ও অধ্যাবসায়ের ফলে ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া ছিলেন।

মিঃ ইব্রাহিম্ লিঙ্কন।

তার পর মিঃ এব্রাহিম লিঙ্কন! লিঙ্কন একজন দরিদ্র সুতারের ছেলে ছিলেন। পিতা তাঁহার পড়ার খরচ যোগাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার সামান্য মাত্র লেখা পড়া করিয়াই পড়া ছাড়িয়া দিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত হইতে হইল। তিনি সামান্য কুলি মজুরের কাজ করিয়া যাহা কিছু রোজগার করিতে লাগিলেন তদ্দ্বারা তাঁহার পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। লিঙ্কন বড় শান্ত এবং শিষ্ট বালক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় প্রখর ছিল। যাই হো'ক, একদিন তিনি তাঁহাদের ভাঙ্গা এক খানা ডিঙ্গি নৌকা লইয়া, তাঁহাদের গ্রামের সন্নিকট কোন একটী ষ্টিমারঘাটে দাঁড়াইয়া ষ্টিমারখানা ছাড়িয়া দেওয়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই, তাঁহার সেই সামান্য বাসনা পূর্ণ হইল। ষ্টিমারখানা সিঁড়ি তুলিয়া বিদায় হইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইত্যবসরে দুইটী ভদ্রলোক আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং ষ্টিমারের সিঁড়ি উঠান হইয়াছে দেখিয়া একটু বিচলিত হইলেন। তখন অদূরে লিঙ্কনকে দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার নৌকার সাহায্যে তাহাদিগকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বালক লিঙ্কন বিনা আপত্তিতে তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া ষ্টিমারে নামাইয়া দিলেন। ভদ্রলোক দু'টী বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী ডলার পুরস্কারস্বরূপ দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক লিঙ্কন প্রথমে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না,

পরে ভদ্রলোক দুইটীর বিশেষ অনুরোধে ডলারটী হাতে লইলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে কি এক ভাবে তিনি নিমগ্ন হইলেন। ভাবিলেন, "তাইত, যদি আমার মত দরিদ্র বালক এই পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে একটা ডলার রোজগার করিতে পারে, তবে যদি একজন মানুষ উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং উপযুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে সে কি হইতে পারে? এই প্রশ্নই তাঁহাকে কি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া ফেলিল, তিনি কি এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

যা'ই হো'ক, লিঙ্কন দরিদ্র। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে অতি সামান্য কাজও করিতে হইত এবং তিনি তাহা অতি সন্তুষ্টের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু তাঁহাকে বড় কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ছিলেন। সমস্ত দিন ভরিয়া রেলওয়ে লাইনের কাট চিরিতেন, অথবা অন্য কোথায়ও সেই রূপ পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতেন। বলা বাহুল্য, সে সবদেশে—সেই আমেরিকায় এই কার্য্যে অন্য সাধারণ কার্য্য অপেক্ষা তাঁহার অধিক পয়সা রোজগার হইত।

লিঙ্কনের পড়া শুনা করিবার বেশ একটা চেষ্টা ছিল। সমস্তদিন তিনি কাজ করিতেন। দু'পুর বেলায় খাবার নিমিত্ত যে এক ঘণ্টা ছুটী পাইতেন, তাহার পনর মিনিট তিনি খাওয়াতে ব্যয় করিতেন, অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল তিনি খবরের কাগজ পড়িতেন। তা'র পর, দিনের কাজ শেষ হইয়া গেলে ঘরে ফিরিবার সময় তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রাস্তার আলোকে খবরের কাগজ পাঠ

করিতেন। এই খবরের কাগজ পড়াই তাঁহার পড়া শুনা এবং ইহা হইতেই যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শেষ জীবনের কার্য্যে একমাত্র সহায় হইয়াছিল।

লিঙ্কন তা'রপর মফস্বলে কোন এক দোকান ঘরে কাজ লইয়াছিলেন এবং সেই দোকানে কাজ করিবার সময়েই তিনি লোকচরিত্র পাঠ করিবার ভালরূপ অবসর পাইয়াছিলেন ও এইখানে কার্য্য করিবার সময়েই কোন এক বন্ধু তাঁহাকে আইন দেখিতে পরামর্শ দেন। তিনিও তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী তখন আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

তৎকালে সে দেশেও এদেশের ন্যায় আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তেমন কোন মুস্কিল ছিল না। পরীক্ষা তখন একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। কোনরূপে কয়েকজন উকীলের সহি লইয়া লাইসেন্স খানা নিতে পারিলেই হইতে পারিত। লিঙ্কনও তাহাই করিলেন। কয়েকমাস মাত্র আইন খানা নাড়িয়া চাড়িয়াই শেষে একখানা লাইসেন্স সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং কোর্টে ওকালতি করিতে লাগিলেন ও তদ্দ্বারায় যাহা রোজগার হইত তাহা হইতে জীবিকানির্ব্বাহ হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে আপন পিতা ও বিমাতাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

যাহাই হো'ক, ইতিমধ্যে নিগ্রোদের সম্বন্ধে আমেরিকাতে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণের ষ্টেট্ সমূহে এই নিগ্রো দাস দাসী কিনিয়া তাহাদের দ্বারা

যাবতীয় কাজ করান হইত। কিন্তু তাহারা গরু, ঘোড়া প্রভৃতির ন্যায় ব্যবহৃত এবং কেনা বেচা হইত এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের কর্ত্তাদের ব্যবহার ঠিক গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর ন্যায় অথবা ততোধিক হইত। কিন্তু এই সময় সেই ব্যবহারের মাত্রাটা একটু বাড়িয়া উঠাতে ক্রীতদাসদাসীদের ক্রন্দনধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তাহা ভগবানের কাণে পৌছিল। উত্তর দিকের ষ্টেট্ সমূহ যেখানে এই ব্যবসায়টা অপেক্ষাকৃত অনেক কম চলিত, সেই সমুদয় ষ্টেটের লোকদের হৃদয় দাসদাসীদের ক্রন্দনধ্বনিতে গলিয়া গেল, তাঁহারা তাহাদের সম্বন্ধে কি করিতে পারেন তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন প্রশ্ন হইল—এই দাস ব্যবসা আর সেদেশে চলিতে পারিবে কিনা? এবং বর্ত্তমান দাসদাসীদিগের যন্ত্রণার উপশম কিরূপে হইতে পারে?

লিঙ্কন একজন সুবক্তা ছিলেন। তিনি কোন সভা সমিতিতে যাইয়া, বসিবার সময় একবারে পশ্চাৎ দিকের বেঞ্চিতে বসিতেন। কিন্তু যখনই তিনি বক্তৃতা করিতে লাগিতেন, তখনই শ্রোতারা তাঁহাকে সে স্থান হইতে সকলের সম্মুখের বেঞ্চিতে লইয়া যাইতেন। এইরূপই তাঁহার বক্তৃতার ক্ষমতা ছিল। যখন উক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তখন লিঙ্কন উত্তর দিকের পক্ষ সমর্থন করেন এবং দক্ষিণ দিকের ষ্টেট সমূহ যাঁহারা এই দাস-ব্যবসায়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'ন। দাসদাসীদিগের যন্ত্রণা কিরূপে উপশম হইতে পারে এই প্রশ্নের

উত্তরে তিনি বলিলেন,—তাহারা মুক্ত হইবে। এদেশে আর কেউ কখন দাসদাসী ক্রয় কিংবা বিক্রয় করিতে পারিবে না। ভগবানের রাজ্যে মানুষের প্রতি এই দুর্ব্যবহার অতিশয় অন্যায়। ভগবানের রাজ্যে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন, প্রত্যেকেই প্রধান। সকলেই, যে পর্য্যন্ত সে যে সুখভোগ করিতে পারে অন্যকেও সেই সুখভোগে বাধা না দেয়, ততক্ষণ সে স্বাধীন। তিনি বলিতে লাগিলেন, একি অন্যায় কথা যে, ভগবানের সৃষ্ট মানুষ মানুষকে কিনিয়া রাখিয়া তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহা করা যাইতে পারে! তাহার উপর যেরূপ ইচ্ছা তাহা করা যাইতে পারে! কি করিয়া মানুষ, মানুষের ক্রীতদাস হইতে পারে? তাহা পারে না, ভগবানের তাহা অভিপ্রেত নহে; যদি তাহাই হইত তবে তাহাদিগকে অন্য কোনরূপ জীব করিয়া সৃষ্টি করিতেন। তাহা যখন করেন নাই, তখন তাহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে তাহাদিগকে আমরা দাসরূপে কিনিয়া লইয়া তাহাদিগের দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি না এবং যেরূপ ইচ্ছা তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে পারি না এবং যদৃচ্ছা তাহাদের উপর ব্যবহার করা যাইতে পারে না, ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় নয়। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হওয়া উচিত নয় সুতরাং হইতে পারে না। আমরাও মানুষ, তাহারাও মানুষ। সুতরাং আমরাও যেপ্রকার স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেছি এবং স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে সক্ষম, আমাদের রাজ্যে অবস্থিত তাহাদেরও সেইরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত। তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে দাসত্ব-

বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অবশ্য তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিব। ভগবানের ইহাই ইচ্ছা। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করা আমাদের ইচ্ছা। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত করিব। তাহারা আমাদিগের ন্যায় স্বাধীন হইবে এবং আমরাও যেরূপ স্বাধীন ভাবে বাস করিয়া আসিতেছি তাহারাও সেইরূপ করিবে।” মিঃ লিঙ্কনের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং ষ্টেটের সমস্ত লোক তাঁহাকে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রি-সভায় সদস্য হইতে অনুমোদন করিলেন। লিঙ্কন অতি অল্প সময়ের মধ্যে ‘হাউস্ অব রি-প্রেজেণ্টেটীভস্’ একখানি স্থান অধিকার করিলেন। তৎপর তথা হইতে দুই বৎসরের মধ্যে সিনেটের একখানি আসন অধিকার করিলেন। তারপর সে স্থান হইতে আর দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহারা প্রতিভা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বাগ্মীতার জোরে তিনিযুক্তরাজ্যের সভাপতির আসন অধিকার করিয়া লইলেন; তাঁহার এই প্রধান পদপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যুক্তরাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ ষ্টেট সমূহের মধ্যে এই ক্রীতদাস-দিগের মুক্তির প্রশ্ন লইয়াই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। লিঙ্কন অচল অটল ভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত উত্তরের ষ্টেট সমূহ চালাইয়া লইয়া দক্ষিনদিগকে পরাজিত করত ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দান করিলেন। তাহারা স্বাধীন হইল, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। লিঙ্কন তাঁহার সত্যতা, ন্যায়, পরয়ণতা, সৎসাহসীকতা ও অধ্যবসায়ের জোরে সামান্য দরিদ্র বালক হইতে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া অবশেষে মানুষের ন্যায় মানুষের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া

ধন্য হইলেন এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। তাঁহার দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সৎসাহসিকতা এবং অসীম অধ্যবসায়ই এই অসামান্য কৃতকার্য্যতার কারণ। যত্ন করিলে রত্ন অবশ্যই মিলিয়া থাকে।

তা'রপর আমাদের এই দেশে এই দুর্দ্দিনেও প্রাতঃস্মরণীয় মিঃ গোখ্‌লেও সত্যনিষ্ঠতা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎসাহসিকতা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা সামান্য লোকও যে অসামান্য কার্য্য উদ্ধার করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার ফারগুশন কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে ভারতের মন্ত্রী সভায় সদস্যপদপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি যে সত্যনিষ্ঠতা, সৎসাহসিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং অধ্যবসায়ের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তিনি এই সাধারণশিক্ষা-বিস্তারের জন্যও পুনঃ পুনঃ মন্ত্রি সভায় পরাজিত হইয়াও ঐ প্রশ্ন পুনরোত্থাপিত করিতে বিরত ছিলেন না। কিন্তু ভারতমাতার নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও আমাদের নিতান্ত ভাগ্যদোষ তা'ই তিনি অকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নতুবা এই শিক্ষাবিস্তারের সমস্যা লইয়া এই অনুপযুক্ত আমাদের ভাবিতেই হইত না এবং ইহা নিশ্চয় যে তিনি যদি আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাঁহার এই সৎ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতেন। কিন্তু কালের কালবিলম্ব সহিল না, অকালে কাল তাঁহাকে হরণ করিয়া লইল। যা'ক, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর না হইবার

নহে। যিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। সুতরাং বৃথা আক্ষেপে কাল কাটাইয়া কোনই লাভ নাই। বরং আমরা যদি, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করত তাঁহার এই মহৎ ইচ্ছা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে এরূপ করিতে পারি তাহাই করা আমাদের সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য এবং ইহাও বিশ্বাস করিতে পারি যে যদি আমরা সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎসাহসিকতা ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব, তাহা হইলে আমাদের এই মহৎ ইচ্ছা অবশ্যই কার্য্যে পরিণত হইবে, ভারতবাসীর নিরক্ষরতা নিশ্চয়ই দূর হইবে। আমরাও মানুষ, মানুষের ন্যায় কার্য্য করিতে অবশ্যই সক্ষম হইব এখন চাই সততা, সৎসাহসিকতা, অটুট উদ্যম এবং অসীম অধ্যবসায়।